আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস : বিষয় ও প্রকরণশৈলী

গবেষক
মোঃ শহিদুল হাসান পাঠান
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৬, শিক্ষাবর্ষ : ২০০৯-২০১০
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

১৪ আগস্ট ২০১৬ রবিবার

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ শহিদুল হাসান পাঠান কর্তৃক উপস্থাপিত 'আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস : বিষয় ও প্রকরণশৈলী' শীর্ষক এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

(ডক্টর মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ও
প্রফেসর, বাংলাবিভাগ
ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা১০০০

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রসঙ্গকথা ১

প্রস্তাবনা ২

প্রথম অধ্যায়: বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় আলাউদ্দিন আল আজাদের অবস্থান ৪-১৯

দ্বিতীয় অধ্যায় : আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস ২০-১৩৪

প্রথম পরিচ্ছেদ – বিভাগোত্তরকালের উপন্যাস ২১-৬১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – স্বাধীনতা-উত্তরকালের উপন্যাস ৬২-১৩৪

উপসংহার ১৩৫-১৩৬

গ্রন্থপঞ্জি ১৩৭-১৪২

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে আলাউদ্দিন আল আজাদ বহুমাত্রিক প্রতিভা। সাহিত্যের সব শাখায় বিচরণ করলেও উপন্যাস রচনায় তিনি প্রদর্শন করেছেন অসামান্য কৃতিত্ব। তাঁর এই কৃতিত্ব নিরূপণের প্রয়াস থেকেই আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে 'আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস: বিষয় ও প্রকরণশৈলী' শীর্ষক এম.ফিল. গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করি। ঔপন্যাসিক হিসেবে আলাউদ্দিন আল আজাদের কৃতিত্ব নিরূপণই এ-গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্য।

গবেষণাকর্মের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত যিনি আমাকে উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন তিনি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন (গিয়াস শামীম)। তাঁর সস্নেহ পরিচর্যা, সুচিন্তিত অভিমত, নিরন্তর তাগিদ, বিদগ্ধ-পরামর্শ ও প্রাজ্ঞ নির্দেশনার কারণেই শেষাবধি এ গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আমার গবেষণাকর্ম নির্বিঘ্ন করার ক্ষেত্রে যিনি প্রয়োজনীয় সুযোগ ও উৎসাহ প্রদান করেছেন তিনি হচ্ছেন নটর ডেম কলেজের অধ্যক্ষ ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও সিএসসি। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁদের সান্নিধ্য আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে, তাঁদের মধ্যে আমার সহকর্মী মিসেস মারলিন ক্লারা পিনেরো, মো. আক্তারুজ্জামান, ড. মো. মিজানুর রহমান, নিখিলেশ ঘোষ, মিসেস সেঁজুতি সাহা, মো. জাবেদ ইকবাল, কে. এম. নূরে মোস্তফা, মিস্ শাপলা বণিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত, নটর ডেম কলেজের প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ স্বর্গীয় ফাদার বকুল এস. রোজারিও সিএসসি'র উৎসাহব্যঞ্জক সহযোগিতার কথাও এপ্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে যার নিরন্তর অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ আমাকে উজ্জীবিত রেখেছে তিনি আমার স্ত্রী আফসানা মুন। আমার প্রতি মুহূর্তের কর্মপ্রেরণার উৎস ছিল দুই কন্যা – সামীহা ও ঋশা। এদের প্রতি রইলো আমার ভালোবাসা।

গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে আমি প্রধানত ব্যবহার করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার। এছাড়া বাংলা বিভাগের সেমিনার, বাংলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমী, জাতীয় গ্রন্থাগারও আমার প্রয়োজন পূরণ করেছে বিভিন্নভাবে। এ প্রসঙ্গে আমি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ। অভিসন্দর্ভ মুদ্রণে আমাকে যিনি উদার সহযোগিতা প্রদান করেছেন তিনি হচ্ছেন নটর ডেম কলেজের অফিস সহকারী বাবুল কুবি। তাঁর প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে এ গবেষণাকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

মোঃ শহিদুল হাসান পাঠান

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) বাংলা সাহিত্যের একজন কীর্তিমান কথাসাহিত্যিক। ছোটগল্পে তো বটেই, উপন্যাস রচনায়ও তিনি অর্জন করেছেন চিরস্মরণীয় কৃতিত্ব। চব্বিশটি উপন্যাস রচনা ও প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে তিনি মুদ্রিত করেছেন অক্ষয় আসন। বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তানি শাসক-শোষকদের অব্যাহত নিপীড়নে ক্ষুব্ধ বাঙালির সংগ্রামী চেতনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উন্মোচিত হয় তাঁর শিল্পিসত্তা। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন এবং বামপন্থার সঙ্গে সম্পৃক্ততা তাঁর চেতনালোকে উপ্ত করে জাতীয়তাবোধ, স্বাধীনতাস্পৃহা, বঞ্চিত মানুষের প্রতি সমবেদনা এবং সুগভীর মানবিক উপলব্ধি। পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্য-দর্শনের পঠন-পাঠনও তাঁর শিল্পিচিত্তে যুক্ত করে আধুনিকতার বোধ; যা তাঁর উপন্যাসে অর্জন করেছে অনন্য মাত্রা। প্রকৃতপক্ষে আলাউদ্দিন আল আজাদের যুগ-প্রত্যাশিত শিল্পিসত্তার প্রতি মুগ্ধতার কারণেই আমি তাঁর উপন্যাস বিষয়ে এম. ফিল. গবেষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

'আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস: বিষয় ও প্রকরণশৈলী' শীর্ষক এ অভিসন্দর্ভে রয়েছে তিনটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে 'বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় আলাউদ্দিন আল আজাদের অবস্থান'। অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায় 'আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস'। এই অধ্যায়টি বিন্যস্ত হয়েছে দুটো পরিচ্ছেদে; প্রথম পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় "বিভাগোত্তরকালের উপন্যাস", দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে "স্বাধীনতা-উত্তরকালের উপন্যাস'। এছাড়াও রয়েছে 'উপসংহার' এবং 'গ্রন্থপঞ্জি'।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দুটি পরিচ্ছেদ এই অভিসন্দর্ভের গুরুত্বপূর্ণ পরিসর। এর প্রথম পরিচ্ছেদে বিশ্লেষিত হয়েছে বিভাগোত্তরকালে প্রকাশিত আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন*, *কর্ণফুলী* এবং *ক্ষুধা ও আশার* বিষয় ও শিল্পরূপ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিশ্লেষিত হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তরকালের *খসড়া কাগজ*, *শ্যামল ছায়ার সংবাদ*, *জ্যোৎস্নার অজানা জীবন*, *যেখানে দাঁড়িয়ে আছি*, *বিপরীত নারী*, *কায়াহীন ছায়াহীন*, *স্বাগতম ভালোবাসা*, *অপর যোদ্ধারা*, *পুরানা পল্টন*, *পুরুদ্রুজ*, *ক্যাম্পাস*, *অনূদিত অন্ধকার*, *স্বপ্নশিলা*, *অন্তরীক্ষবৃক্ষরাজি*, *প্রিয় প্রিন্স*, *কালোজ্যোৎস্নায় চন্দ্রমল্লিকা*, *বিশৃঙ্খলা*, *ঠিকানা ছিল না*, *তোমাকে যদি না পাই*, *হলুদ পাতার ঘ্রাণ* প্রভৃতি উপন্যাসের বিষয়ভাবনা ও প্রকরণবৈশিষ্ট্য।

বর্তমান অভিসন্দর্ভে উপন্যাসের মূলপাঠসমূহ প্রধানত গৃহীত হয়েছে আলাউদ্দিন আল আজাদের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও স্বনির্বাচিত উপন্যাস থেকে। বলাবাহুল্য, স্বাধীনতা-উত্তরকালে তাঁর অনেক উপন্যাসই স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। প্রায় সবকটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস* এবং *স্বনির্বাচিত উপন্যাস* গ্রন্থে। এজন্য এ-দুটো গ্রন্থ গবেষণার জন্য মূল পাঠরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও অভিসন্দর্ভে বেশকিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়েছে। এজন্য আমি অনুতপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় আলাউদ্দিন আল আজাদের অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় আলাউদ্দিন আল আজাদের অবস্থান

সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ও জনপ্রিয় রূপকল্প হচ্ছে উপন্যাস। লেখকের জীবনদর্শন ও দেশ-কাল-সমাজ নিয়ে গড়ে ওঠে উপন্যাসের অবয়ব। এটি এমন এক শিল্পমাধ্যম – যার মাধ্যমে উদ্ভাসিত হয় মানবজীবনের বহুমাত্রিক রূপায়ণ। 'উপন্যাসের কাছ থেকে আমরা জীবনের সামগ্রিক রূপের সন্ধান চাই। সমাজ এবং সমাজ-বিধৃত মানুষ, পট এবং পট-নির্ভর জীবন উপন্যাসের উপাদান।'[১] Ralph Fox-এর মতে :

> 'The novel is the epic-form of our modern, bourgeois society ... it did not exit, except in very rudimentary form before that modern civilisation which began with the renaissance and like every new art-form it has served its purpose extending and deepening human consciousness.'[২]

'বুর্জোয়া সমাজের শক্তি এবং স্বাতন্ত্র্যে আত্মস্থ হয়ে, মধ্যযুগীয় জীর্ণ সামন্তসমাজ-কাঠামো ভেঙে দেওয়ার অভীপ্সা নিয়ে, উপন্যাসের জন্ম। নবোত্থিত শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং বুর্জোয়া-সেবিত সমাজই উপন্যাসের আদি-জনয়িতা। আধুনিক যুগে সমাজ ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে ব্যক্তিমানুষের যে সংগ্রাম – তারই মহাকাব্যিক রূপ উপন্যাস।'[৩] অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে নব-উদ্ভূত বুর্জোয়াশ্রেণির স্বরূপ অন্বেষণের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভব হয় উপন্যাসের। প্রায় শতবর্ষের ব্যবধানে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে কলকাতাকেন্দ্রিক মধ্যশ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। যার পরিপ্রেক্ষিতে নবসৃষ্ট আধুনিক জীবন ও মধ্যবিত্তশ্রেণিকেন্দ্রিক জীবনপ্যাটার্নের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে সূচিত হয় উপন্যাসের স্মরণীয় যাত্রা। স্মর্তব্য যে, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনক্ষমতা লাভের পর বুর্জোয়াশ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ প্রক্রিয়ার পাশাপাশি

---

[১] সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়,*বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ,১৯৮০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৪

[২] Ralph Fox : *The Novel and the people*,1937, Progress Publishers, Moscow, P. 27

[৩] বিশ্বজিৎ ঘোষ : *বাংলাদেশের সাহিত্য*, প্রথম সংস্করণ ২০০৯, আজকাল, ঢাকা, পৃ. ১০১

মধ্যবিত্তের জনজীবনেও নেমে আসে বিপর্যয়। সর্বোপরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতির কারণে এদেশের জনজীবন ব্যবস্থায় সাধিত হয় দ্রুত পরিবর্তন; রূপান্তর ঘটে ভূমিকেন্দ্রিক সামন্ততান্ত্রিক জীবনব্যবস্থায় এবং কৃষিজীবীদের জীবন ও জীবিকায়। পরিবর্তনের ধারায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে ব্রিটিশদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ফলে চিত্রপট পাল্টে যায় ভারতীয় উপমহাদেশের। লর্ড কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) ফলে জমিদারশ্রেণি ও ভূমিতে ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে সমাজকাঠামোয় ব্যাপক ভাঙচুর সংঘটিত হয়; সাধারণ প্রজাশ্রেণির জীবনে নেমে আসে ভয়াবহ বিপর্যয়। একদিকে ইংরেজসৃষ্ট জমিদার, মধ্যস্বত্বভোগী, মহাজন, ভূমিমালিক (কৃষক), ব্যবসায়ী, শ্রমিক প্রমুখ; অন্যদিকে ব্রিটিশদের বাণিজ্যনীতি তথা রাজস্ব আদায়, জমি নিলাম, জমির মালিকানা হস্তান্তর প্রভৃতি কারণে চিরাভ্যস্ত জীবনধারা পাল্টে যায়।

ইংরেজরা কেবল প্রশাসনযন্ত্রেই নয়, সমাজব্যবস্থার সর্বস্তরে পরিবর্তনের ধারা সূচিত করে। তাদের কল্যাণেই 'উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিচেতনায় সমৃদ্ধ এক শিক্ষিত জনশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। পাশ্চাত্য ভাবধারা ও জীবনচেতনায় পরিপুষ্ট এই শ্রেণীসৃষ্টির পেছনে হিন্দু কলেজ (১৮১৭), ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭), ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি (১৮১৮) প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।'[১] কল্লোলিত কলকাতার আলোকিত ব্যক্তিবর্গ কোনো-না-কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে।'ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বাণিজ্যপুঁজি (marchantile capitalism) ও শিল্পপুঁজি (industrial capitalism)-নির্ভর শাসনযন্ত্র কলকাতা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের সমাজগঠন ও জীবনবিন্যাসের বস্তুগত ও ভাবগত রূপান্তরকে করে তোলে অনিবার্য।'[২] ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। আর নব্য সমাজে রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) প্রমুখ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সমাজ জীবনে সূচিত হয় লক্ষণীয়

[১] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, পুনর্মুদ্রণ ২০০৯, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, পৃ. ৪

[২] রফিকউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

পরিবর্তন। ক্ষণজন্মা এ ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে সংঘটিত হয় বধূদাহ প্রথা নিবারণ, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিরোধ, বিধবাবিবাহ প্রবর্তন প্রভৃতি সামাজিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তি মানুষের মন ও মননে সাধিত হয় প্রভূত পরিবর্তন। একদিকে সামন্ততান্ত্রিক জীবনব্যবস্থা অন্যদিকে নব্যসৃষ্ট বুর্জোয়াশ্রেণির অভিঘাতের ফলে সমাজে যে স্বতন্ত্র ও ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয় সেসব উপস্থাপনের প্রয়োজনে সাহিত্যক্ষেত্রে নবতর রূপাঙ্গিকের আত্মপ্রকাশ ঘটে। যে পুরাতন রীতি-নীতি ও সামাজিক শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভের প্রচেষ্টা থেকে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও আত্মমর্যাদাবোধ উন্মোচিত হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, সাহিত্যক্ষেত্রে তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে উপন্যাসের বিস্তৃত রূপাঙ্গিকে। সুতরাং বলা যায়, বুর্জোয়াশ্রেণি বা আধুনিক জীবন ব্যবস্থার রূপ-রূপান্তরের সঙ্গে উপন্যাসের সম্পর্ক ওতপ্রোত। পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের প্রভাবে বাঙালি সমাজে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ, বিজ্ঞানচর্চা, নবতর মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটেছে এবং সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে পরিবর্তিত জীবনধারার সূচনা ঘটেছে তারই রূপান্বিত শিল্পপ্রয়াস প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-১৮৮৩) *আলালের ঘরে দুলাল* (১৮৫৮)। উপন্যাসটির বিষয়বস্তুতে এসেছে কলকাতার উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানদের নীতিহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা পরিপ্রেক্ষিতে বিত্তের সঙ্গে বিদ্যার সমন্বয়-প্রত্যাশা। লক্ষণীয়, 'ইংল্যান্ডে রেনেসাঁস এবং বুর্জোয়া বিপ্লবের ফলে ডিফোর রবিনসন ক্রুশো সৃষ্ট হয়েছে। আমাদের দেশেও উনিশ শতকের নবজাগরণের পরে 'আলাল' রচিত।[১]

প্যারীচাঁদের অব্যবহিত পরবর্তী পর্যায়ে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)। প্রকৃতপক্ষে তিনিই বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক স্রষ্টা। সমকালীন জীবনবাস্তবতার সঙ্গে ইতিহাস ও রোমান্স অবলম্বনে তিনি রচনা করেন অসাধারণ সব উপন্যাস। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসসমূহ হচ্ছে: *দুর্গেশনন্দিনী*(১৮৬৫),*কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬), *মৃণালিনী* (১৮৬৯),*বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩), *ইন্দিরা* (১৮৭৩), *কৃষ্ণকান্তের উইল* (১৮৭৮), *রাজসিংহ* (১৮৮২), *আনন্দমঠ* (১৮৮২), *দেবী*

[১]সারোয়ার জাহান, *বাংলা উপন্যাস : সেকাল-একাল*, জানুয়ারি ১৯৯১, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ; ২৮

চৌধুরানী(১৮৮৪), *সীতারাম* (১৮৮৭) প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বিষয়চেতনায় প্রাধান্য পেয়েছে স্বদেশপ্রেম, মানবপ্রেম, ধর্মতত্ত্ব, দাম্পত্যধর্ম, সনাতন জীবনভাবনা এবং নীতিও শিল্পের বিরোধ প্রভৃতি। 'সমসাময়িক যে-সব ঘটনা তাঁর উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে তার সবই মফস্বল বাংলার পটভূমিকায় রচিত। সমকালীন কলকাতাই জীবনের ঘূর্ণিপাককে বঙ্কিম উপন্যাসে প্রায় এড়িয়ে চলেছেন। অবসর-শিথিল, জীবিকা-যন্ত্রণা-শূন্য গ্রামীণ বড়লোকেরাই তাঁর সমকালাশ্রয়ী উপন্যাসের পাত্রপাত্রী।'[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী পর্যায়ে বাংলা উপন্যাস ধারায় লক্ষণীয় পরিবর্তন আনেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত রবীন্দ্র-উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব থাকলেও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত *চোখের বালিতে*(১৯০২) তিনি বিস্ময়কর স্বকীয়তা প্রদর্শন করেন এবং ঘটনাপ্রধান উপন্যাসের পরিবর্তে রচনা করেন মনস্তত্ত্বপ্রধান উপন্যাস। উপন্যাসে 'রবীন্দ্রনাথের মুখ্য উদ্দেশ্য দেশ, সমাজ ও সময়শাসিত চরিত্রসমূহের অন্তস্তল উন্মোচন করা, তাদের স্বাতন্ত্র্য পরীক্ষা করা ও অন্তর্লক্ষণের নির্যাসশক্তি চিহ্নিত করা।'[২] সেইসূত্রে 'চোখের বালিতে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসযাত্রার প্রকৃত আরম্ভ।'[৩] 'কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ এ-উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন রোমান্টিক স্বপ্নকল্পনা, আবেগময় প্রেমানুভূতি, অবাস্তব আদর্শবিলাস, কবিতাময় জীবনানুভব এবং ব্যক্তিচেতনাশ্রয়ী জীবনার্থ। চরিত্রচিত্তের প্রেমাকাঙ্ক্ষা, অচরিতার্থতা, অন্তর্জ্বালাময় অস্থিরতা, বেদনাকাতর সন্তোষ ও ক্লাসিক পরিতৃপ্তি এ-উপন্যাসের দুর্লভ সম্পদ। 'সেদিনকার বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে' চোখের বালি আকস্মিক; যুগ-আকাঙ্ক্ষার শৈল্পিক প্রতিফলক। পরবর্তীকালের সাহিত্যে, বিশেষত উপন্যাস-সাহিত্যে এর আবেদন নিঃসন্দেহে সুদূরসঞ্চারী।'[৪] অতঃপর বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে তিনি রচনা করেন *নৌকাডুবি*(১৯০৬), *গোরা* (১৯১০), *চতুরঙ্গ* (১৯১৬), *ঘরে-বাইরে* (১৯১৬), *যোগাযোগ* (১৯২৬), *শেষের কবিতা* (১৯২৯), *চার অধ্যায়* (১৯৩৪) প্রভৃতি উপন্যাস।

---

[১] সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

[২] সৈয়দ আকরম হোসেন, *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ৩৫৯

[৩] সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

[৪] গিয়াস শামীম সম্পাদিত, *চোখের বালি*, ভাষাপ্রকাশ মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৫, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৭

তাঁর এসব উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে রোমান্টিক প্রেম, মানবীয় ঘাত-প্রতিঘাত, ভারতীয় জাতীয়তা, স্বদেশী আন্দোলন, আত্মমুক্তি, আত্মবিশ্বাস প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের সমকালে বাংলা উপন্যাস ধারায় আবির্ভাব ঘটে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮)। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের পট-পরিপ্রেক্ষিত গ্রামীণ জীবন। মানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিশ্বস্ত রূপায়ণে তাঁর উপন্যাস সমৃদ্ধ। তিনি উপন্যাসে ব্যক্ত করেছেন হিন্দু-সমাজের আবহমান প্রচলিত কুসংস্কার, সামাজিক সমস্যা ও বিবিধ অসঙ্গতি। তাঁর উপন্যাসে বিচিত্র ধরনের চরিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি যেসব উপন্যাস রচনা করেন তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য *বড়দিদি* (১৯১৩), *বিন্দুর ছেলে* (১৯১৪), *বিরাজ বৌ* (১৯১৪), *পণ্ডিতমশাই* (১৯১৪), *পল্লী-সমাজ* (১৯১৬), *শ্রীকান্ত ১মপর্ব* (১৯১৭), *দেবদাস* (১৯১৭), *চরিত্রহীন* (১৯১৭), *দত্তা* (১৯১৮), *শ্রীকান্ত ২য় পর্ব* (১৯১৮), *গৃহদাহ* (১৯২০), *বামুনের মেয়ে* (১৯২০), *দেনা-পাওনা* (১৯২৩), *পথের দাবী* (১৯২৬), *শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব*(১৯২৭), *শেষ প্রশ্ন* (১৯৩১), *শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব* (১৯৩৩) প্রভৃতি। শরৎচন্দ্রের লেখায় বিধৃত হয়েছে পল্লিজীবন, একান্নবর্তী পরিবার, বৈধব্য সমস্যা, বর্ণপ্রথা ও অস্পৃশ্যতা, নারীর সতীত্ব, মানবতাবোধ, সামাজিক কিংবা অসামাজিক প্রেম প্রভৃতি প্রসঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পরবর্তী পর্যায়ে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমের মতো উপন্যাসেও যুগান্তসৃষ্টিকারী পরিবর্তন সংঘটিত হয়। 'প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই গ্রামজীবন ক্রমশ অপসারিত হয়ে আসছিল উপন্যাসের জগৎ থেকে। শরৎচন্দ্রের পরে গ্রামীণ পরিবারকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসের ধারা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের দিকে মোটর গাড়ীর প্রচলনের ফলে শহরের সীমানা বিস্তৃত হয়। নূতন জনবসতির চাপে গড়ে ওঠে নূতন নূতন শহরতলী। ফলে শহর ও গ্রামের মধ্যবর্তী সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে। উপন্যাসের পটভূমি হিসাবে শহরতলীর জীবন লেখকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে।'[১]পরিবর্তিত এই জীবনবৈশিষ্ট্যকে অঙ্গীকার করে উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করেন একঝাঁক কালজয়ী ঔপন্যাসিক; যাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-

[১]শাহীদা আখতার, *পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস*, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯২, বাংলা একাডেমি, ঢাকা,পৃ. ৬২

১৯৫৭)। ত্রিশের যুগের কিছুটা পূর্বে শক্তিশালী ঔপন্যাসিক হিসেবে উন্মেষ ঘটে তাঁর। তাঁর উপন্যাসগুলোর প্রধান উপজীব্য নিয়তির কাছে ব্যক্তির অসহায়তা, আধুনিক মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা প্রভৃতি। 'তাঁর কথাসাহিত্যে শিল্পিত হয়েছে বিপর্যস্ত মানবাত্মার বিনষ্টি, মানুষের ক্লিন্ন-বিকার এবং অন্তশ্চাপ-বহিশ্চাপসম্ভব বহুমাত্রিক অসঙ্গতি।...তবে, অসঙ্গতি আর বিকৃতির রূপকার হলেও, জগদীশ গুপ্ত অন্তিমে তাঁর গল্প-উপন্যাসে নির্মাণ করেন মানুষের সীমাহীন সম্ভাবনার ইতিকথা, মনুষ্যত্বহীনতার সময়-সংক্রান্তিতে আকাঙ্ক্ষা করেন মানবিকতার অভ্যুদয়।'[১] তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসসমূহ হচ্ছে – *লঘু-গুরু* (১৯২৯), *অসাধু অসাধু সিদ্ধার্থ* (১৯২৯), মহিষী(১৯২৯), *দুলালের দোলা* (১৯৩১), *রোমন্থন* (১৯৩১), *তাতল সৈকতে* (১৯৩১),*রতি ও বিরতি* (১৯৩৪), *নন্দ ও কৃষ্ণা* (১৯৪৭), *যথাক্রমে* (১৯৫৩) প্রভৃতি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮), রুশ বিপ্লব (১৯১৭), মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১) প্রভৃতি ঘটনার অভিঘাতে বাঙালির জীবনপরিসরে সূচিত হয় ব্যাপক পরিবর্তন। এই পরিবর্তন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে উপন্যাস-সাহিত্যেও সঞ্চারিত করে ব্যাপক পরিবর্তন। এ সময়ে *কল্লোল* (১৯২৩), *কালিকলম* (১৯২৬), *প্রগতি* (১৯২৭), *পরিচয়* (১৯৩১) পত্রিকাগুলোর আত্মপ্রকাশ ঘটে। এবং এই সময়ের পরিবর্তিত জীবনধারা উঠে আসে নবীন লেখকদের উপন্যাসে।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে *কল্লোল* পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এক দল নতুন ঔপন্যাসিকের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০-১৯৭৬), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮),সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬০), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪),মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) প্রমুখ। 'কল্লোল-গোষ্ঠী'র ঔপন্যাসিকের চিন্তা-চেতনায়

[১] বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ*,প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি, ঢাকা,পৃ. ৫৮

প্রাধান্য পেয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির রোমান্টিক অনুভূতি, নিষিদ্ধ প্রেম ও নরনারীর যৌনবিলাস। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিম্নবিত্ত শ্রেণির জীবনবাস্তবতা, শাহরিক জীবনের ক্ষত-বিক্ষত চিত্র। 'ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব, ব্যক্তির মুক্তি পিপাসা, ব্যক্তির প্রেমপিপাসা, ব্যক্তির দেহচেতনা, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, ব্যক্তির আত্মানুসন্ধানের প্রবণতা এ কালের কথাসাহিত্যে ক্রমশ মুখ্য হয়েছে।'[১]

ত্রিশোত্তর কালপর্বের অর্থাৎ কল্লোল যুগের ব্যতিক্রমধর্মী শিল্পী ছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।'কল্লোল-পর্বের ধারণা হলো– মানুষের উপরিতলবর্তী বিবেকের অন্তরালে নিগূঢ় বিরাট অবচেতন কার্যকর। মানুষের সক্রিয়তা কেবল বিবেকচালিত নয়, বরং লিবিডোশাসিত এবং মনোজগতের অবচেতন স্তর দ্বারা পরিচালিত। সিগমুন্ড ফ্রয়েড, কার্ল গুস্তাভ য়ুং, হ্যাভলক এলিস প্রমুখের মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণসূত্রে অধিসত্তা(super-ego)-চালিত মানুষ সম্পর্কে বিশ্বাসের এই বিপর্যয় কল্লোল-পর্যায়ের অর্থাৎ ত্রিশের কালের লেখকদের একটা অসম্পূর্ণ, বিকারগ্রস্ত ও পঙ্কমথিত জীবনবোধে উপনীত করে। ফলে তাঁদের কথাশিল্পও হয়ে ওঠে এই খণ্ডিত জীবনপ্রত্যয়ের শিল্পরূপ। বলা বাহুল্য, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কল্লোলীয় এই নেতিচেতনায় আস্থাশীল ছিলেন না; লিবিডোর পরিবর্তে তিনি দুঃখ, মমতা ও কারুণ্যকে মানবজীবনের পরম সম্পদ বিবেচনা করেছেন। মানুষের ওপর কখনোই আস্থা হারাননি তিনি। মানুষ ও মানবতা তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মে অভিষিক্ত হয়েছে উচ্চমূল্যে।'[২] তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হচ্ছে *পথের পাঁচালী* (১৯২৯), *অপরাজিত*(১৯৩২), *দৃষ্টিপ্রদীপ* (১৯৩৫) *আরণ্যক* (১৯৩৯), *দেবযান* (১৯৪৪), *ইছামতী* (১৯৫০), *অশনি সংকেত* (১৯৫৯) প্রভৃতি।

ত্রিশোত্তর বাংলা উপন্যাসের কালজয়ী ব্যক্তিত্ব তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। 'তারাশঙ্কর একটি নিয়ত রূপান্তরশীল শক্তির নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তিসত্তা বা গোষ্ঠীসত্তা কিভাবে আন্দোলিত হচ্ছে, যুগের চোরা খরস্রোতে কিভাবে সমাজ ও ব্যক্তি পরিবর্তিত হচ্ছে তার বাস্তব চিত্র দেখাতে

[১]গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, তৃতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০১০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১৭৮

[২]গিয়াস শামীম সম্পাদিত, *পথের পাঁচালী*, ভাষাপ্রকাশ মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৫, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৭

চেয়েছিলেন।'[১]রাঢ় অঞ্চলের সমাজ-সংস্কৃতির বাস্তব রূপচিত্রাঙ্কনে তিনি প্রদর্শন করেছেন অসামান্য দক্ষতা। 'কালের দ্বৈরথকে আত্মস্থ করেই তিনি শিল্পী। সমাজের রূপ-রূপান্তর এবং ব্যক্তি ও সমাজচৈতন্যেরপরস্পরিত-সম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচনে তাঁর উপন্যাস এপিক-বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ। সমকালীন রাজনীতির গতিচিহ্ন রূপায়ণের দক্ষতায়, সময়ধর্ম ও যুগধর্মের স্বনিষ্ঠ অনুধ্যানে এবং সর্বোপরি আস্তিক্যধর্ম-নির্ভর আশাবাদী জীবনবোধের সমন্বয় প্রয়াসে তারাশঙ্কর-সাহিত্য বাঙালির সমকালীন সমাজ-ইতিহাসের চিরায়ত শিল্পসাক্ষ্য।'[২]*চৈতালী ঘূর্ণি* (১৯২৯-৩০), *ধাত্রীদেবতা* (১৯৩৯), *কালিন্দী* (১৯৪০), *কবি* (১৯৪২), *গণদেবতা* (১৯৪৩), *পঞ্চগ্রাম* (১৯৪৪),*মন্বন্তর* (১৯৪৪), *ঝড় ও ঝরাপাতা* (১৯৪৬),*হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* (১৯৪৭), *নাগিনী কন্যার কাহিনী* (১৯৫২) *অরণ্য-বহ্নি* (১৯৬৬), প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

বাংলা কথাসাহিত্যের ব্যতিক্রমধর্মী শিল্পী বনফুল। তিনি অভিজ্ঞতাবাদী বা প্রকৃতিবাদীর মতো জীবনদৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর সাহিত্যকর্মে।[৩] 'বিশ্বযুদ্ধোত্তর সাহিত্যচর্চায় বনফুলের বিচরণ রোম্যান্টিক কিংবা স্বপ্নবিলাসী পরিমণ্ডলে নয়; বরং চিরায়ত মানবভুবনে। তাঁর সাহিত্যভাবনা তত্ত্বচালিত কিংবা ইজমনির্ভর নয়; তিনি মানুষকে দেখেছেন মানুষী দৃষ্টিভঙ্গিতে।'[৪]*তৃণখণ্ড* (১৯৩৫), *দ্বৈরথ* (১৯৩৭), *মৃগয়া* (১৯৪০), *জঙ্গম* (প্রথম খণ্ড ১৯৪৩, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৪৫, তৃতীয় খণ্ড ১৯৪৫), *স্থাবর* (১৯৫১), *কৃষ্ণপক্ষ* (১৯৭৩) প্রভৃতি।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় *মাটির ঘর* (১৯৩১), *ঝড়ো হাওয়া* (১৩৩০), *বাংলার মেয়ে* (১৩৩২), *জোয়ার ভাঁটা* (১৩৩৩), *পূর্ণচ্ছেদ* (১৩৩৬), *অনাহূত* (১৩৩৯), *অনিবার্য*(১৩৩৯) প্রভৃতি উপন্যাসমূহে অঙ্কন করেছেন সাঁওতাল-বাউরি-কুলি-কামিন ধাঙরদের অজ্ঞাত জীবন।

---

[১]প্রসেনজিৎ মৃধা, *উপন্যাসের আঙ্গিক ও তারাশঙ্কর*, প্রথম প্রকাশ ২০১২, কলকাতা, একুশশতক, পৃ. ১৪৮

[২] ভীষ্মদেব চৌধুরী, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি*, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৩২৪

[৩] মিজানুর রহমান খান, বনফুলের ছোটগল্প : জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৮, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ২৩৮

[৪]মীর হুমায়ূন কবীর সম্পাদিত, *শ্রেষ্ঠ গল্প : বনফুল*, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৮

কল্লোলযুগের অবিসংবাদিত কথাশিল্পী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। সমকালীন জীবনের ক্লেদ-পঙ্কিল জীবনবাস্তবতা, প্রান্তিক মানুষের জীবনসংগ্রাম, প্রেম ও লিবিডোর উপস্থাপনায় তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র। *বেদে* (১৯২৮), *আকস্মিক*(১৯৩০), *কাকজ্যোৎস্না* (১৯৩১) প্রভৃতি উপন্যাসের বিষয়চেতনায় তাঁর এসব প্রবণতা স্পষ্ট।

কল্লোল যুগের অন্যতম সার্থক ঔপন্যাসিক প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর *পাঁক* (১৯২৬), *উপনায়ন* (১৯৩৩), *মিছিল* (১৯৩৩) প্রভৃতি উপন্যাসের বিষয় সমকালীন জীবনপরিসরে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। 'একমাত্র প্রেমেন্দ্র মিত্রই হলেন কল্লোলের ক্রোড়ে লালিত সেই লেখক যাঁর অসঙ্গতি অল্প।...মানুষের দুঃখবেদনাকে মূল্য প্রদানের চেষ্টায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমগ্র শিল্পপ্রয়াসে একটা সূত্রবিধৃতি ঘটেছে।'[১]

বাংলা উপন্যাসের কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব সতীনাথ ভাদুড়ী। 'বাংলা সাহিত্যে বাংলার বাইরের জীবন-পরিবেশ অবলম্বনে যে-সমস্ত শিল্পী-ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন তাঁদের মধ্যে সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬০) অসামান্য। বিহারের অন্তর্গত পূর্ণিয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অতিনিবিড়। প্রথম উপন্যাস *জাগরী* (১৯৪৫) থেকে শুরু করে প্রায় সমগ্র সাহিত্যকর্মে তিনি প্রধানত উপস্থাপন করেছেন পূর্ণিয়ার পট-পরিবেশ এবং তৎসন্নিহিত মানবজীবনের বিচিত্র-বর্ণিল কর্মপ্রবাহের অন্তরঙ্গ চালচিত্র।[২] তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে *গণনায়ক* (১৯৪৮), *চিত্রগুপ্তের ফাইল* (১৯৪৯), *ঢোঁড়াই চরিতমানস* (১৩৮৮), *অচিন রাগিণী* (১৯৫৪), *অপরিচিতা* (১৯৫৪), *সংকট* (১৯৫৭), *আলোকদৃষ্টি* (১৯৬৪) প্রভৃতি।

বাংলা উপন্যাসের কালক্রমে বুদ্ধদেব বসু এক যুগাতিক্রমী কথাশিল্পী। 'বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস মূলত তাঁর মর্মকোষ উৎসারিত অভিজ্ঞানের শিল্পভাষ্য। আত্মজৈবনিক উপাদানে

[১]সরোজ বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০

[২]গিয়াস শামীম, *বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস*, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১৫, প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ১২৫

গড়ে-ওঠা বুদ্ধদেবের উপন্যাসভুবন, বস্তুত, তাঁর ব্যক্তিচেতনারই শিল্পিত প্রতিভাস।'[১] বুদ্ধদেব বসু'র *সাড়া* (১৯৩০), *সানন্দা* (১৯৩৩),*ধূসর গোধুলি* (১৯৩৩), *যেদিন ফুটলো কমল* (১৯৩৩),*লাল মেঘ* (১৯৩৪), *বাসর ঘর* (১৯৩৫), *পরিক্রমা* (১৯৩৮), *কালো হাওয়া* (১৯৪২), *তিথিডোর* (১৯৪৯), *মৌলিনাথ* (১৯৫২), *রাত ভ'রে বৃষ্টি* (১৯৬৭) প্রভৃতি উপন্যাসের বিষয়বস্তু আত্মানুভূতি, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক প্রেমচেতনা।

ত্রিশোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতিক্রমধর্মী। 'কল্লোলের কুলবর্ধন তিনি; নিরন্তর কল্লোলিত বহমান স্রোতস্বতীর মতো; গতিপথের পঙ্ক অপসারণ করে জীবনের সমুদ্রসমান ব্যাপ্তিবীক্ষণই ছিল তাঁর নিয়ত আরাধ্য। দীর্ঘ আটাশ বছরের সাহিত্যসাধনায় তিনি অবলম্বন করেছেন স্বতঃশ্চল মানবজীবন, সমাজ এবং তৎসংশ্লিষ্ট কল্পলোকের মনোদৈহিক বিচিত্র বিভঙ্গের সমৃদ্ধ চালচিত্র।[২]বিজ্ঞানের ছাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচিত প্রায় সকল গল্পেই মানব মনস্তত্ত্বের জটিল বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের আলোকে। পাশাপাশি তাঁর অনেক গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে মার্কসবাদী চিন্তাচেতনা।[৩]*জননী* (১৯৩৫), *দিবারাত্রির কাব্য* (১৯৩৫), *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬), *পুতুলনাচের ইতিকথা* (১৯৩৬), *জীবনের জটিলতা* (১৯৩৬), *অহিংসা* (১৯৪১), *চতুষ্কোণ* (১৯৪২), *দর্পণ* (১৯৪৫), *চিহ্ন* (১৯৪৭), *জীয়ন্ত* (১৯৫০), *স্বাধীনতার স্বাদ* (১৯৫১), *আরোগ্য* (১৯৫৩), *পরাধীন প্রেম* (১৯৫৫) প্রভৃতি উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, রোমান্টিকতা, প্রান্তজনের জীবন ও জীবিকা, শ্রমজীবী মানুষের প্রত্যাশা ও অচরিতার্থতা, দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের জীবন বাস্তবতাস্বরূপ, প্রেম, রাজনীতি, বিপ্লব-বিদ্রোহ ইত্যাদি প্রসঙ্গ। 'মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক, আর্থনীতিক পটভূমির ব্যাখ্যা উপন্যাসরচনায় জরুরী বলে মনে করেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।'[৪]

---

[১]বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ*, প্রথম প্রকাশ: জুন ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৩১১

[২] গিয়াস শামীম, *বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

[৩] তানিম জসিম,*শ্রেষ্ঠ গল্প : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৭

[৪]অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়,*কালের প্রতিমা*, পঞ্চম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, দে'জ পাবলিশিং,কলকাতা, পৃ. ১০৫

বাংলা উপন্যাসের বিকাশধারায় মুসলিম ঔপন্যাসিকদের অবদানও এতৎপ্রসঙ্গে স্বীকার্য। উনিশ শতকের বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমকালে বাংলা উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করেন মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১)। তাঁর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রন্থ *বিষাদসিন্ধু* (১৮৮৫-১৮৯১)। এ উপন্যাসে তিনি কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনা অবলম্বনে রচনা করেন ইতিহাস-আশ্রয়ী রোমান্স। বাংলা উপন্যাসে তাঁর অবদান সত্যিই প্রশংসনীয়।

মীর মশাররফ হোসেনের উত্তরসূরি হিসেবে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে উপন্যাস-সাহিত্যেযাঁরা আত্মপ্রকাশ করেছেন তাঁদের উপন্যাসসমূহ হচ্ছে – মোহাম্মদ নজিবর রহমানের (১৮৬০-১৯২৩) *আনোয়ারা* (১৯১৪), কাজী আবদুল ওদুদের (১৮৯৪-১৯৭০) *নদীবক্ষে* (১৯১৯), কাজী ইমদাদুল হকের (১৮৮২-১৯২৬) *আবদুল্লাহ* (১৯৩৩),কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) *বাঁধন হারা* (১৯২৭), *মৃত্যুক্ষুধা* (১৯৩০), *কুহেলিকা* (১৯৩১), হুমায়ুন কবিরের (১৯০৬-১৯৬৯) *নদী ও নারী* (১৯৪৫) প্রভৃতি। এসব উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে মুসলিম সমাজ ও পরিবারের বিভিন্নমাত্রিক চিত্র।

১৯৪৭ সালে ভারতবিভাগের কারণে বাংলা ভাষাভাষী দুই অঞ্চলের জীবনধারায় আসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। এই পরিবর্তন কেবল আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই নয়, শিল্পসাহিত্যেও ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। ত্রিশোত্তরকালে কলকাতাকেন্দ্রিক উপন্যাসে যে জীবন উপস্থাপিত হয়েছে, বিভাগোত্তরকালে পূর্ব বাংলায় রচিত উপন্যাসে তৎপরিবর্তে গৃহীত হয়েছে ভিন্নতর জীবনানুষঙ্গ। জীবনের ভূগোল যেন অকস্মাৎ বদলে গেছে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকচক্রের অব্যাহত নিপীড়ন-শোষণ বঞ্চনায় বাঙালি ধীরে ধীরে সম্বিৎ ফিরে পেতে শুরু করে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন তাদের মনোভাব ও বিশ্বাসে নিয়ে আসে ব্যাপক পরিবর্তন।যার পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের বিভিন্ন রূপকল্পের মতো উপন্যাসেও তাঁরা সে পরিবর্তনকে অঙ্গীকার করেন এবং বাংলা উপন্যাসের ত্রিশোত্তর জীবনস্রোতের প্রতি হয়ে পড়েন নিবেদিত ও একাগ্র। 'বাংলাদেশের উপন্যাসের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্তের জীবনদর্শন ও অস্তিত্বজিজ্ঞাসার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস; যে মধ্যবিত্তশ্রেণী দেশবিভাগকালীন অশক্ত, অসংঘবদ্ধ অবস্থা থেকে ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ৫৪-র নির্বাচনী সাফল্য, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ও ৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের চালিকাশক্তিতে

পরিণত হয়েছে – তার দ্বন্দ্বময়, রক্তাক্ত ও সংগ্রামী অগ্রযাত্রার ইতিহাস।'[১]এ সময়কালে রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসসমূহ হচ্ছে: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র (১৯২২-১৯৭১) *লালসালু* (১৯৪৮), *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪), *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮); আবুল মনসুর আহমেদের (১৮৯৭-১৯৭৯) *সত্যমিথ্যা* (১৯৫০), *জীবনক্ষুধা* (১৯৫৫) ও *আবেহায়াত* (১৯৬৮); আবুল ফজলের (১৯০৩-১৯৮৩) *রাঙা প্রভাত* (১৩৬৪), সত্যেন সেনের (১৯০৭-১৯৭৩) *ভোরের বিহঙ্গী* (১৯৫৯), *অভিশপ্ত নগরী* (১৯৬৯), *পাপের সন্তান* (১৯৬৯); আবু জাফর শামসুদ্দীনের (১৯১১-১৯৮৮) *মুক্তি* (১৯৪৮), *ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান* (১৯৬৩); শওকত ওসমানের (১৯১৭-১৯৯৮) *জননী* (১৯৫৮), *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬২), *সমাগম* (১৯৬৭), *চৌরসন্ধি* (১৯৬৮); শহীদুল্লা কায়সারের (১৯২৬-১৯৭১) *সারেং বউ*(১৯৬২) ও *সংশপ্তক* (১৯৬৫); সরদার জয়েনউদ্‌দীনের (১৯১৮-১৯৮৬) *আদিগন্ত* (১৯৫৯), *পান্নামোতি* (১৯৬৪), *নীল রং রক্ত* (১৯৬৫), *অনেক সূর্যের আশা* (১৯৬৭); শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের (১৯২৬-১৯৯৭) *আলমনগরের উপকথা* (১৯৫৪), *কাশবনের কন্যা* (১৯৫৪), *কাঞ্চনমালা* (১৯৬১); রশীদ করিমের (১৯২৫-২০১১) *উত্তম পুরুষ* (১৯৬১), জহির রায়হানের (১৯৩৫-১৯৭২) *শেষ বিকেলের মেয়ে* (১৯৬০), *হাজার বছর ধরে* (১৯৬৪); আবু ইসহাকের (১৯২৬-২০০৩) *সূর্য-দীঘল বাড়ি* (১৯৫৫) প্রভৃতি। এসব উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে ইতিহাস-ঐতিহ্য ও পুরাণকথার সঙ্গে আবহমান বাঙালির জীবনকথা, সংস্কার ও সংস্কৃতির বিচিত্রমাত্রিক চিত্র।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে যেসব ঔপন্যাসিক মুখ্য ভূমিকা পালন করেন তাঁদের অনেকেই সক্রিয় ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ-পূর্বকালীন বাংলাদেশের উপন্যাস-সাহিত্যে। এ সময়কালে রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসসমূহ হচ্ছে: আনোয়ার পাশার (১৯২৮-১৯৭১) *রাইফেল রোটি আওরাত* (১৯৭৩), আবু ইসহাকের (১৯২৬-২০০৩) *পদ্মার পলিদ্বীপ* (১৯৮৬), *সমুদ্র বাসর* (১৯৮৬), *জাল* (১৯৮৮); সৈয়দ শামসুল হকের (জ. ১৯৩৫) *নীল দংশন* (১৯৮১), *স্মৃতিমেধ* (১৯৮৬), *মৃগয়ায় কালক্ষেপ* (১৯৮৬), *স্তব্ধতার অনুবাদ* (১৯৮৭), *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ* (১৯৮৯-৯০); শওকত আলীর (জ. ১৯৩৬) *প্রদোষে প্রাকৃতজন* (১৯৮৪), *অপেক্ষা* (১৯৮৫), *দক্ষিণায়নের দিন* (১৯৮৫), *কুলায়*

[১]রফিকউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

কালস্রোত (১৯৮৬); আহমদ ছফার (১৯৪৩-২০০১) *ওঙ্কার* (১৯৭৫),*একজন আলী কেনানের উত্থান পতন* (১৯৮৯), *মরণ বিলাস* (১৯৯০); হাসান আজিজুল হকের (জ. ১৯৩৯)*বৃত্তায়ন* (১৯৯১), *আগুনপাখি* (২০০৬); আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের (১৯৪৩-১৯৯৭) *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৭) ও *খোয়াবনামা* (১৯৯৬); রিজিয়া রহমানের (জ. ১৯৩৯) *উত্তর পুরুষ* (১৯৭৭), *ধবল জ্যোৎস্না* (১৯৮১), সূর্য সবুজ রক্ত (১৯৮১), একাল চিরকাল (১৯৮৪); সেলিনা হোসেনের (জ. ১৯৪৭) *হাঙর নদী গ্রেনেড* (১৯৭৬) ও *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* (১৯৮৬), হুমায়ূন আহমেদের (১৯৪৮-২০১২) *নন্দিত নরকে* (১৯৭২), *শঙ্খনীল কারাগার (১৯৭৩), কোথাও কেউ নেই (১৯৯০), আগুনের পরশমনি (১৯৮৬)* ইত্যাদি। এসব ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে বিষয়চেতনায় এসেছে গ্রামীণ জীবনবাস্তবতা, নগর জীবনের জটিলতা, উপজাতি, জেলে ও আঞ্চলিক জীবন, মনোবিকলন, যৌনবিকৃতি, শ্রেণিবৈষম্য ইত্যাদি।

বিভাগোত্তরকালে উপন্যাসজগতে যে কয়জন ঔপন্যাসিক নিরীক্ষাধর্মী উপন্যাস-রচনায় মনোনিবেশ করেন আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ভারতবাসীর স্বাধীনতা আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তর-দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সাহিত্যবোধের উন্মেষ ঘটে।১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এদেশের মানুষের আবেগময় প্রত্যাশা এবং লাগামহীন উচ্ছ্বাস তিনি যেমন প্রত্যক্ষ করেছেন, ঠিক তেমনি তাদের আশাভঙ্গের বেদনারও করুণ সাক্ষী ছিলেন তিনি। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অব্যাহত শোষণ-নিপীড়ন এবং বৃহত্তর বাঙালির সংগ্রাম-সংক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে তাঁর স্মরণীয় আবির্ভাব ঘটে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। এ সময়েই ভাষা শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশে তিনি রচনা করেন বিখ্যাত কবিতা '*স্মৃতিস্তম্ভ*' (স্মৃতির মিনার)। তাঁর লেখনীতে প্রতিফলিত হয়েছে সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংকটের বহুমাত্রিকতার

রূপ। 'বাঙালির অহংকার ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ তাঁর লেখায় ভিন্ন এক মাত্রা অর্জন করে।'[১]

প্রকৃতপক্ষে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ভাষাভিত্তিক যে জাতীয়তাবোধ উন্মেষিত হয় তার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েই সাহিত্যক্ষেত্রে আলাউদ্দিন আল আজাদের স্মরণীয় অভিষেক ঘটে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিতির ফলে তাঁর জীবনধারায় সূচিত হয় প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা। তদুপরি বাম-রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত থাকায় সাধারণ মানুষের অধিকার সম্পর্কে তাঁর মধ্যে তৈরি হয় লক্ষণীয় দায়িত্ববোধ। মূলত দৈশিক এবং আন্তর্দেশিক এসব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, বাদ-মতবাদের মিথস্ক্রিয়ায় আলাউদ্দিন আল আজাদের সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করে স্বতন্ত্র মহিমায়। তিনি'সাহিত্য সাধনায় আমার পঁচিশ বছর: স্বাধীনতা উত্তরকাল' শীর্ষক এক প্রবন্ধে তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে বলেছেন : ... এ পর্যন্ত আমার সাহিত্য জীবনে স্পষ্ট দুইভাগ। স্বাধীনতা পূর্বকাল পঁচিশ বছর (১৯৪৬-১৯৭০) এবং স্বাধীনতা উত্তরকাল পঁচিশ বছর (১৯৭১-১৯৯৬)।'[২] তাঁর এই পঞ্চাশ বছরের সাহিত্যসাধনাকে স্পষ্টত দুটো পর্যায়ে বিন্যস্ত করা যায় : বিভাগোত্তরকাল এবং স্বাধীনতা-উত্তরকাল। তাঁর উপন্যাসের আলোচনায়ও এই দুই সময়কাল পৃথকভাবে বিবেচনাযোগ্য। বিভাগোত্তরকালে রচিত তাঁর উপন্যাসসমূহ হচ্ছে –*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* (১৯৬০), *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন* (১৯৬২), *কর্ণফুলী* (১৯৬২) ও *ক্ষুধা ও আশা* (১৯৬৪)। *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* ও *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন* উপন্যাসদ্বয়ে দাম্পত্যজীবনের জটিলতা, ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের স্বরূপ, নিঃসঙ্গতা, আত্মোপলব্ধি, আত্মজিজ্ঞাসা, ফ্রয়েডীয় লিবিডো প্রভৃতি বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। কর্ণফুলী নদীতীরবর্তী মানুষের অভ্যাস-আচরণ-জীবনবোধ, তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনধারা অর্থাৎ local color and

[১]দেবব্রত চক্রবর্তী বিষ্ণু, 'যিনি প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন', *আলাউদ্দিন আল আজাদ জীবন সাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০০৩, গতিধারা, ঢাকা, পৃ. ৭৯

[২]আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'সাহিত্য সাধনায় আমার পঁচিশ বছর : স্বাধীনতা উত্তর কাল', *আলাউদ্দিন আল আজাদ জীবন সাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০০৩, গতিধারা, ঢাকা, পৃ. ১৩৩

habitationsভাষারূপ পেয়েছে *কর্ণফুলী* উপন্যাসে। লোকজ মানুষদের জীবন-জীবিকা, প্রেম, সংগ্রামমুখর জীবনএ-উপন্যাসে স্পষ্ট। অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে তিনি রচনা করলেন *ক্ষুধা ও আশা* উপন্যাস। আলাউদ্দিন আল আজাদ যে বরাবরই নিরীক্ষাপ্রবণ ছিলেন তা তাঁর এসব উপন্যাসের বিষয় ও রচনারীতিতে সুস্পষ্ট। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির জাতীয় জীবনে তাৎপর্যময় ঘটনা। নয়মাস ব্যাপী যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে এদেশের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থাও পাল্টাতে থাকে দ্রুত। এরূপ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা-উত্তর কালপর্বে রচিত উপন্যাসেও সাধিত হয় পরিবর্তন। এ সময়কালে আলাউদ্দিন আল আজাদের চিন্তাধারায়ও ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধোত্তরকালে তিনি মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা, মধ্যবিত্তের দুঃসহ জীবনবাস্তবতা, নিম্নবিত্ত মানুষদের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা-হতাশা-পরাজয়, নব্য বুর্জোয়া শ্রেণির উত্থান প্রভৃতি বিষয়কে পরবাস্তবতাবাদ, অস্তিত্ববাদ ও ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের অভিঘাতে রূপায়ণ করেছেন বৈচিত্র্যময় ঘটনাসহযোগে।

মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ে আলাউদ্দিন আল আজাদের লেখা উপন্যাসসমূহ হচ্ছে-*খসড়া কাগজ* (১৯৮৩) *অপর যোদ্ধারা* (১৯৮৩), *স্বাগতম ভালোবাসা* (১৯৮৩), *পুরানা পল্টন* (১৯৮৪), *জ্যোৎস্নার অজানা জীবন* (১৯৮৪), *যেখানে দাঁড়িয়ে আছি* (১৯৮৪), *শ্যামল ছায়ার সংবাদ* (১৯৮৬), *অনূদিত অন্ধকার* (১৯৯১), *স্বপ্নশিলা* (১৯৯২), *অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি* (১৯৯৩), *পুরুদ্রুজ* (১৯৯৪), *প্রিয় প্রিন্স* (১৯৯৫), *কালোজ্যোৎস্নায় চন্দ্রমল্লিকা* (১৯৯৫), *বিপরীত নারী* (১৯৯৫), *ক্যাম্পাস* (১৯৯৬), *বিশৃঙ্খলা* (১৯৯৭), *তোমাকে যদি না পাই* (১৯৯৮), *ঠিকানা ছিলনা* (১৯৯৮), *হলুদ পাতার ঘ্রাণ* (১৯৯৯), *কায়াহীন ছায়াহীন* (১৯৯৯)।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রকাশিত আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে জাতীয় জীবনের বিচিত্র ঘটনা – মুক্তিযুদ্ধ, রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিরাজিত বিশৃঙ্খলা, স্বৈরাচারী পতন আন্দোলন, উচ্চবিত্তের ভণ্ডামি, চরিত্রস্খলন ও আত্মপ্রতারণা প্রভৃতি। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা, যেমন, মুক্তিযুদ্ধকালীন হত্যা, ধর্ষণ, অত্যাচার-নির্যাতন, শরণার্থী সমস্যা,মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রভৃতি প্রসঙ্গও বিধৃত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের অস্থিরতা, লুণ্ঠন, ছিনতাই প্রভৃতি ঘটনাকে উপজীব্য করেও তিনি রচনা

করেছেন উপন্যাস। *অপর যোদ্ধারা* (১৯৮৩), *যেখানে দাঁড়িয়ে আছি* (১৯৮৪), *ঠিকানা ছিল না* (১৯৯৮), *ক্যাম্পাস* (১৯৯৬), *প্রিয় প্রিন্স* (১৯৯৫) প্রভৃতি উপন্যাসসমূহে বিধৃত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর পর্বের নানা ঘটনার চালচিত্র। নব্বইয়ের গণআন্দোলন (এরশাদবিরোধী আন্দোলন) ও স্বৈরাচার পতনের প্রেক্ষাপটে *পুরুদ্রুজ* (১৯৯৪) নামক উপন্যাস রচনা করেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। উপন্যাসটিতে ১৯৯০ সালের শহিদ নূর হোসেনের জীবন বিসর্জনের কাহিনি উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন তিনি। ঔপন্যাসিক স্বাধীনতা-উত্তরকালের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নগরকেন্দ্রিক জীবনব্যবস্থা অবলম্বনে যেসব উপন্যাস রচনা করেছেন সেগুলো হচ্ছে: *খসড়া কাগজ*, *পুরানা পল্টন*, *কালোজ্যোৎস্নায় চন্দ্রমল্লিকা*, *বিপরীত নারী*, *অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি*, *ঠিকানা ছিলনা*, *কায়াহীন ছায়াহীন*, *হলুদ পাতার ঘ্রাণ* প্রভৃতি।

স্বাধীনতা-উত্তরকালের জটিল জীবনবাস্তবতা, মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গজনিত মর্মন্তুদ অন্তর্দাহ, অর্থনৈতিক সংকট, উচ্চবিত্ত শ্রেণির আচার-আচরণ ও লালসা, প্রেম, নৈতিক অবক্ষয়, বিকৃত প্রেম, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও অন্তঃসারশূন্যতা লক্ষ করা যায় আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাসে। নগরজীবনের পটভূমিতে রচিত তাঁর এ পর্যায়ের উপন্যাসগুলো উজ্জ্বল।

আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস কোন গতানুগতিক জীবনবৃত্তে আবদ্ধ থাকেনি। সমকালীন বাস্তবতাকে প্রাধান্য দিয়েই মানবচরিত্রের রূপ-রূপান্তর উন্মোচনে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। তাঁর উপন্যাস যুগবাস্তবতার প্রতিচ্ছবি।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিভাগোত্তরকালের উপন্যাস

বিভাগোত্তরকালে আলাউদ্দিন আল আজাদ উপন্যাসের বিষয়নির্বাচনে এবং শৈলিনির্মাণে ছিলেন পরীক্ষাপ্রবণ। বহুব্যবহৃত গতানুগতিক বিষয়ের অনুবর্তন না করে তিনি জীবনানুগ বিষয়-গ্রন্থনায় ছিলেন অধিকতর মনোযোগী। ফলে সমকালীন ঔপন্যাসিকদের তুলনায় তিনি সহজেই সারস্বত সমাজের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়েছেন। এই পর্যায়ে রচিত উপন্যাসসমূহ হচ্ছে *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন*, *কর্ণফুলী* এবং *ক্ষুধা ও আশা*। প্রত্যেকটি উপন্যাস বিষয় ও প্রকরণ-পরিচর্যায় স্বতন্ত্র। বলা যায় বিভাগোত্তরকালে রচিত উপন্যাসই আলাউদ্দিন আল আজাদকে বাংলাদেশের উপন্যাস-সাহিত্যে করে তুলেছে স্মরণীয়।

তেইশ নম্বর তৈলচিত্র

আলাউদ্দিন আল আজাদের (১৯৩২-২০০৯) *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*[১] (১৯৬০) বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যের একটি অনবদ্য ও সফল সংযোজন। চিত্রশিল্পী জাহেদের জীবন-পরিণামকে ঔপন্যাসিক শিল্পরূপ দিয়েছেন এ উপন্যাসে। একজন শিল্পীর সংবেদনশীলতা ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা অসাধারণ নৈপুণ্যে এ উপন্যাসে অঙ্কন করেছেন লেখক।

আলাউদ্দিন আল আজাদের প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসসমূহ প্রধানত প্রেম ও মনস্তত্ত্বনির্ভর। ব্যক্তিমনের চেতন-অবচেতন স্তরের সূক্ষ্ম ও জটিল রূপ *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* উপন্যাসে যুক্ত করেছে স্বতন্ত্র মাত্রা। একজন মনোবিদের সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে এ উপন্যাসে চরিত্রপাত্রের বিচিত্র-জটিল অভিক্ষেপের শিল্পরূপ দিয়েছেন ঔপন্যাসিক।

---

[১]আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র', *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ২০০১, গতিধারা, ঢাকা। বর্তমান গ্রন্থে 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' উপন্যাসের পাঠ এ সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে। উপন্যাসটি অনিয়মিত সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা *পদক্ষেপের* ঈদসংখ্যায় (১৯৬০) প্রথম প্রকাশিত।

তেইশ নম্বর তৈলচিত্র আলাউদ্দিন আল আজাদের শিল্পীজীবনের প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসটি প্রথম ছাপা হয়েছিল *পদক্ষেপ* নামের একটি অনিয়মিত কাগজের ঈদসংখ্যায়। এ উপন্যাস প্রসঙ্গে লেখকের অভিমত নিম্নরূপ:

> *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* আমার প্রথম উপন্যাস। যে কোনো লেখক শিল্পীর প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে তার যে অনুরাগ ও দুর্বলতা, এই লেখাটিও আমার হৃদয়ে তেমনি মিঠেকড়া, কাটাগুল্মময়, কখনো বা স্বপ্নের মায়াবৃক্ষ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* উপন্যাসটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে, তার নামকরণ ছিল 'বসুন্ধরা।'[১]

তেইশ নম্বর তৈলচিত্র উপন্যাসের ঘটনাংশ উন্মোচিত হয়েছে চিত্রশিল্পী জাহেদের জীবনালেখ্য ও জীবন-ভাবনাকে উপলক্ষ করে। ঔপন্যাসিক নর-নারীর প্রেম ও দাম্পত্যজীবনের এক গভীর সত্যের উন্মোচন ঘটিয়েছেন এ উপন্যাসে। যে দুজনকে উপলক্ষ করে উপন্যাসের ঘটনাংশ পল্লবিত হয়েছে তারা হচ্ছে শিল্পী জাহেদ ও তার স্ত্রী ছবি। অবশ্য 'বড়ো ও ছোটো পরিসরের অনেকগুলো প্রেমকাহিনীর যোগফলই উপন্যাস তেইশ নম্বর তৈলচিত্র।'[২] উপন্যাসে মানবজীবনের অতিসূক্ষ্মআন্তঃমানবিক সম্পর্ক নির্মাণে ঔপন্যাসিকের পারদর্শিতা নিঃসন্দেহে প্রশংসাব্যঞ্জক।

তেইশ নম্বর তৈলচিত্র উপন্যাসের কাহিনি নির্মিত হয়েছে শিল্পী জাহেদের দাম্পত্যজীবন এবং দাম্পত্যজীবন-বিকেন্দ্রিক ভাবপ্রবণতাকে উপলক্ষ করে। একজন দারিদ্র্যপীড়িত চিত্রশিল্পীর জীবনগাথা উপস্থাপনের পাশাপাশি তার প্রেম, লিবিডো, মনোবিকার, দাম্পত্য জীবনের টানাপোড়েন, অন্তর্যন্ত্রণা, নিঃসঙ্গতা প্রভৃতিও রূপায়িত হয়েছে এ উপন্যাসে। উপন্যাসের বিষয়ভাব প্রসঙ্গে কয়েকজন সমালোচক যে অভিমত জ্ঞাপন করেছেন তা লক্ষণীয় :

> এক. আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর প্রথম উপন্যাসেই একজন ভিন্নধর্মী ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস *'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র'* (১৯৬০) বিশ্লেষণমূলক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। বিবাহ-পূর্ব জীবনে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ছবিকে কেন্দ্র করে শিল্পী জাহিদের মনোলোকে ক্রিয়াশীল নানাবোধ ও উপলব্ধির বিশ্লেষণ এই উপন্যাস।[৩]

---

[১] আলাউদ্দিন আল আজাদ, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ২০০১, প্রাগুক্ত, ঢাকা, পৃ. ১৩

[২] মুহম্মদ মুহসিন, 'আদর্শবাদের অস্বস্তিতে আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস', মাঘ ১৪১৭, *মাসিক উত্তরাধিকার*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৩৬-৩৭

[৩] খোন্দকার শওকত হোসেন, *বাংলাদেশের উপন্যাস গ্রামীণ সমাজ*, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পুপলার পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ. ৫০

দুই. আলাউদ্দিন আল আজাদের *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* (১৯৬০) ও *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন* (১৯৬২) উপন্যাসে ব্যক্তিমানুষের সংকট, মনোবিকলন, অন্তর্যন্ত্রণা ও যৌনবিকৃতির বিন্যাস ঘটেছে। এ উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বচিন্তাকে শৈল্পিক অনুশীলনের সদর্থকতায় উন্নীত করতে সমর্থ হয়েছিলেন ঔপন্যাসিক।[১]

তিন.আলাউদ্দীন আল আজাদের (জন্ম ১৯৩৪) *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* (১৯৬০)-এ ব্যক্তিজীবনের কামনা-বাসনার রূপায়ণ ঘটেছে। নাগরিক মধ্যবিত্ত মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও বিকৃতির কিছু চিত্র আছে এ উপন্যাসে। কাহিনীর শেষে জীবনের সুস্থতায় উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত।[২]

চার. একজন চিত্রশিল্পীর প্রেমকাহিনীকে ঘিরে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। উপন্যাসের নায়ক শিল্পী জাহেদ আমাদের জীবনের বৃহত্তর সামাজিক পটভূমিকায় চিত্রিত হয়নি; চিত্রিত হয়েছে তার ব্যক্তিজীবনের রহস্যময় দ্বীপের বিচিত্র অভিজ্ঞতার পটে।[৩]

পাঁচ. *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* (১৯৬১) একটি নতুন ভাবধারাসমৃদ্ধ উপন্যাস।[৪]

তেইশ নম্বর তৈলচিত্র উপন্যাসের সূচনা পর্যায়ে ঔপন্যাসিক করাচির পটভূমিকায় দৃশ্যচিত্র অঙ্কন করেছেন। তার প্রাসঙ্গিক অংশ লক্ষণীয়:

> প্রথম দিনেই পুরস্কার ঘোষণা। বিদেশী কূটনীতিবিদ, উচ্চ সরকারী কর্মচারী, গণ্যমান্য নাগরিক, সাংবাদিক ও দর্শক নারী-পুরুষে ঘরটা জমজমাট। জাতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী, হয়তো তাই এতো ভিড়। (*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ১৫)

করাচিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় চিত্রপ্রদর্শনীতে শিল্পী জাহেদের ছবি 'বসুন্ধরা' বা 'মাদার আর্থ' অর্জন করে প্রথম স্থান। এ অনন্য স্বীকৃতিতে জাহেদের মনে সৃষ্টি হয় ব্যাপক আনন্দানুভূতি। অতঃপর জাহেদের মনোজাগতিক ভাবনা-চেতনার বিচিত্রমাত্রিক প্রকাশ ঘটেছে উপন্যাসে।'একজন যথার্থ শিল্পীর মহৎ প্রেরণা হচ্ছে প্রেম– এই প্রেমই হচ্ছে সকল সৃষ্টির মূল কথা। ... প্রেমের এই মহৎ শক্তি উপন্যাসের নায়ক জাহেদকে শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। তার কর্ম স্বীকৃতি পেয়েছে। পুরস্কৃত হয়েছে।'[৫] উপন্যাসের দ্বিতীয়

---

[১] রফিকউল্লাহ খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫

[২] শাহীদা আখতার, *পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস*, জুন ১৯৯২, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৮৯-৯০

[৩] মনসুর মুসা, *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*, জুলাই ২০০৮, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, পৃ. ৮৯

[৪] রশীদ আল ফারুকী, *বাংলার জাগরণ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৫৪

[৫] সিকদার আবুল বাশার (সম্পা.) *আলাউদ্দিন আল আজাদ : জীবন ও সাহিত্য*, বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৫১

পরিচ্ছেদে শিল্পী জাহেদের অবচেতনসত্তায় প্রেম আলোড়ন তুলেছে। নায়িকা ছবির প্রতি তার মনের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে এভাবে:

> আমি জানতে পারিনি অতি সাধারণ শাড়িপরা দুঃখের দুলালী এই নিরাভরণ মেয়েটি কখন আমার অন্তরে প্রবেশ করেছে। অল্পক্ষণের পরিচয়, তাতেই যে বেদনার সরোবর টলটল করে উঠল, আমার ছোট্ট সম্বোধনটি হয়তো তার থেকে জন্ম নেওয়া লালপদ্ম! (*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ২৪)

শিল্পী জামিলের মাধ্যমে জাহেদের সঙ্গে ছবির পরিচয়, ভালোলাগা, অতঃপর প্রণয়। প্রথম সাক্ষাতেই জাহেদ ছবিকে ভালোবেসেছিল। নায়ক জাহেদের রঙের তুলিতে অঙ্কিত হয়েছে শুধুই ছবির নন্দিত অবয়ব। শিল্পী জাহেদের অনুরাগসিক্ত মানসপটে ছবির যে মূর্তি অঙ্কিত হয়েছে তা রহস্যময়তায় আচ্ছন্ন:

> একদিন দেখি পরিচয় হওয়ার পর থেকে যত নারীমূর্তি এঁকেছি, প্রত্যেকটিতেই ওর আদল, কোনোটায় মুখের গড়ন, কোনোটায় দেহের ভঙ্গি, কোনোটায় চোখের দৃষ্টি। আমি সজ্ঞানে কোনোদিন ওকে আঁকতে চেয়েছি বলে মনে পড়ে না। অথচ এমন, এর অর্থ কী। অলৌকিক কিছু নয়, হবে নিশ্চয়ই রহস্যময়। (*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ২৬)

অতঃপর প্রণয়সূত্রে শিল্পী জাহেদের সঙ্গে ছবির বিয়ে হয়। কিন্তু বিবাহ-পরবর্তী সময়ে শিল্পী জাহেদের মনোজগতে ছবিকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় সন্দেহ, দ্বন্দ্ব ও আত্মশক্তির সংকট। ছবির যে দেহখানি একদা জাহেদকে মুগ্ধ, বিস্মিত ও সম্মোহিত করেছিল, তা বাসর রাতের উজ্জ্বল আলোয় প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিল জাহেদ, কিন্তু ছবি তার সে ইচ্ছায় বাধ সেধেছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে হারিকেনের মৃদু আলোয় তার ঘুমন্ত নিটোল দেহখানি প্রত্যক্ষ করল উৎসুক জাহেদ এবং চমকে উঠল:

> ... একি! এসব কিসের চিহ্ন! ভালো-মত দেখতে গিয়ে কপালের দু'পাশের রগ ছট্‌ছট্‌ করতে থাকে। বই পড়েছি, ভুল হতে পারে না, এ যে স্পষ্ট মাতৃত্বের ছাপ! নুয়ে ওর শরীরটা শুঁকে শুঁকে দেখি এসেন্সের আড়ালে আরো একটি গন্ধ আছে, যা, কেবল মায়ের গায়েই থাকতে পারে; তা হলে ছবি কি এতদিন প্রাণপণে লুকিয়ে এসেছে কিছু? (*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ৪৯)

ছবির মধ্যে মাতৃত্বের চিহ্ন অবলোকন করে মানসিক যন্ত্রণায় বিদ্ধ হতে থাকে জাহেদ। অথচ ছবিকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসে সে। তার ভালোবাসার মধ্যে প্রতারণা ও ভণ্ডামি নেই। কিন্তু অকস্মাৎ ছবি সম্পর্কে তার মনে জন্ম নেয় প্রবল অবিশ্বাস। তার অসহায়তা, নিঃসঙ্গতা ও শূন্যতা অন্তহীন যন্ত্রণায় পরিণত হয়। তাই বলে জীবন তো থেমে থাকে না। জীবনের প্রয়োজনে সমস্ত চৈতন্য দিয়ে সে ছবির মঙ্গলের কথাই ভেবেছে। ছবিও কখনও মিথ্যা

দোষারোপে তাকে জর্জরিত করেনি, এমনকি ছবিকে স্বাভাবিক রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছে জাহেদ। অবশেষে একদিন ঘটনাক্রমে জাহেদ ছবিকে প্রশ্ন করেছিল এভাবে:

> তোমার একটা ছেলে হয়েছিল একথা সত্য কিনা? ... সত্য বলছি, তুমি সন্তানের জননী! আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার মাস ছয়েক আগে তোমার ছেলে হয়েছিল! (*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ৫৩)

জাহেদের প্রশ্নে ছবির চেতনালোকে অকস্মাৎ উদ্রিক্ত হয় হতাশা, ভীতিবিহ্বলতা। তবু জীবনের খতরনাক অধ্যায়টি সে গোপন করে না জাহেদের কাছে। সবকিছু শোনার পর জাহেদ সমর্পিত হয় এক অনামা শূন্যতায়:

> শাদা মেঘগুলো দক্ষিণ থেকে মৃদুমন্দ গতিতে উত্তরে উড়ে যাচ্ছে, রাতের আকাশে পূর্ণচাঁদের মাতাল জোছনা। ছড়িয়ে পড়ছে অফুরন্ত ধারায়। একি জোছনা অথবা ধারালো পরিহাস? মেথর পল্লী থেকে ঢিমিক ঢিমিক ঢোল-করতালের বাজনা ভেসে আসছিল, সাধারণের কি উল্লাস! ফূর্তি করছে সারাদিনের খাটুনির পর মদ আর তাড়ি টানছে দেদার, মেয়ে মানুষের গলা জড়িয়ে মাতলামি করছে। হ্যাঁ এরাই সুখী! সত্যিকারের সুখী। কারণ এদের মনের বালাই নেই। ... আসলে বিয়েশাদী ব্যাপারটাকে একটা নেহায়েৎ দরকারী কাজ বলে ধরে নিতে পারলেই সকল সমস্যার সমাধান। মনের সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলির সঙ্গে একে জড়িয়ে ফেলার মতো বোকামি আর কিছু নেই! তাতে মিছে জ্বালা মিছে যন্ত্রণা। (*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*,পৃ. ৫৭)

ছবির অপ্রত্যাশিত অতীত ঘটনা শ্রবণের পরও জাহেদ তাই মুষড়ে পড়েনি, বরং বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছে সে। স্ত্রী ছবির ওপর বলাৎকারের ঘটনা শুনে তার শুধুই মনে হয়েছে তা ছিল নিছক একটা দুর্ঘটনা। তাই ছবিকে সে ঘৃণার বদলে দিয়েছে ভালোবাসা, শাস্তির বদলে দিয়েছে মানসিক শান্তি ও স্বস্তি। কারণ জীবনকে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে চেয়েছে সে। কোনো জটিলতার পথে এগিয়ে যেতে চায়নি সে। ছবিকে আলিঙ্গন করে জাহেদ বলেছিল:

> প্রথম ভেবেছিলাম বুঝি ভয়ংকর কিছু, কিন্তু পরে বুঝলাম তোমার আমার ভালোবাসাটাই বড় সত্য!(*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*,পৃ. ৫৮)

শিল্পী জাহেদ ছবিকে উদারচিত্তে ভালোবাসতো। ছবির জীবনের অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা তার সংবেদনশীল মনে তাই তেমন কোনো নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেনি। এমনকি ছবিকে ছেড়ে দূরে কোথাও বেড়াতে আসলেও ছবি ও টুলটুলের কথা ভুলতে পারেনি সে। এ প্রসঙ্গে তার অন্তর্ময় সংলাপ লক্ষণীয়:

> টুলটুলের জন্যে একটি খেলনা উড়োজাহাজ ও কিছু গরম জামাকাপড় কিনলাম। কিন্তু ছবির জন্য নেব কি? ও কিছু বলেনি। বলেছিল তুমি শুধু ফিরে এসো ব্যস আর কিছু চাই না। (*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ৬৮)

আলাউদ্দিন আল আজাদের মূল গল্প আদর্শায়িত জাহেদ-ছবির প্রেম। ছবির ভাই জামিলের বেল্টের পিটুনি খেয়ে প্রেমিক জাহেদ তার প্রেমের প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এরপর ছবির কুমারীত্ব হারানোর দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার বর্ণনা ছবির কাছ থেকে শুনেও প্রেমের প্রতি একনিষ্ঠ থেকেছে এবং প্রেমের দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এই হলো আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাসের প্রেমিক ও প্রেমের আদর্শায়ন।

তেইশ নম্বর তৈলচিত্র উপন্যাসের মৌল বিষয় হচ্ছে বিবাহ-পূর্ব প্রেম এবং দাম্পত্য জীবনের জটিল মনস্তত্ত্ব ও অন্তর্যন্ত্রণা। উপন্যাসের নায়ক জাহেদ আত্মদ্বন্দ্বে বিক্ষত অনুভূতিসর্বস্ব একজন মানুষ। মনস্তত্ত্ব আর মনোবিকলনের জটিল পরিক্রমায় আলাউদ্দিন আল আজাদ উপন্যাসে নর-নারীর বহুমাত্রিক জটিলতা-যন্ত্রণার ছবি চিত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন। উপন্যাসের প্রারম্ভে শিল্পী জাহেদের প্রেমপ্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, মধ্য পর্যায়ে দাম্পত্যজীবনের সংশয় ও আত্মজিজ্ঞাসা এবং পরিণতিতে সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে ছবির কাছে প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি বাস্তব জীবনধারার এক চলমান রূপ-রূপান্তর।

শিল্পী জাহেদের অন্তর্লোকে প্রেমের অনুভূতি গভীর ও ব্যাপক; যা সীমিত কালকে অতিক্রম করে সর্বকালে ও সর্বলোকে পরিব্যাপ্ত:

> মিলন ছাড়া ভালোবাসা সম্পূর্ণ হয় না, টিকবে কি করে। দেহে দেহে আত্মায়-আত্মায় বিন্দু-বিন্দু মিশে যাওয়ার নামই প্রেম। প্রেম দেহেরই পরম শিখা, সেজন্য দেহের অবসান ঘটলেও শিখা দাউদাউ করে জ্বলতে পারে। তার মৃত্যু হয় না। (*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ৩৪)

বিবাহোত্তর প্রেম এবং সে-প্রেমে যৌন-কামনা তথা কামপ্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে জাহেদ-ছবি সম্মুখীন হয়েছে জটিল জীবনাবর্তে। উপন্যাসে ছবির দুঃসহ স্মৃতিকাতরতা যেমন উপস্থাপিত হয়েছে, ঠিক তেমনি প্রতিফলিত হয়েছে তার মাতৃত্বের স্বরূপ। উপন্যাসে দেখা যায় অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রত্যাশিত এক দুর্ঘটনায় ছবি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। অতঃপর ধীরে ধীরে ছবির হৃদয় ও মনে জেগে ওঠে মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু ছবি জানে তার এ আকাঙ্ক্ষার স্বীকৃতি দেবে না পরিবার ও সমাজ। তাই জন্মদানের পরপরই সন্তানটিকে মেরে ফেলতে

বাধ্য হয় ছবি। কিন্তু মৃত সন্তানের প্রতি মমতাময় অনুভূতি কখনই বিস্মৃত হতে পারেনি সে। যে-কোনো শিশুর প্রতি ছবির অবচেতন মনের যে টান তাও একসময় ধরা পড়ে জাহেদের কাছে:

> কিছুদিন থেকে একটা জিনিস লক্ষ্য করছি যখনই আসি দেখি নোটন আর শিউলিকে নিয়েই ব্যস্ত ছবি। ভাইয়ের ছেলেমেয়েকে ভালোবাসবে নিশ্চয়ই কিন্তু এমনটা কোথাও দেখিনি। সকালে এলে দেখা যায় দুটিকে নিয়ে পড়াচ্ছে, ... যেন ওরা মানব-সন্তান নয় মেজে ঘষে ঝকমকে করে তোলার মতো কোন ধাতব বস্তু! বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে এলে ওদেরকে খাইয়ে দাইয়ে ওই বারান্দাটুকুর মধ্যে নানারকম খেলায় মেতে ওঠে। সন্ধ্যায় বাতি লাগিয়ে বলে কিসসা কাহিনী রূপকথা উপকথা আজগুবি গল্প। আমাকে যেন দেখেও দেখে না, সংক্ষিপ্ত কথাটুকুই সেরে চলে যায়। (*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ৪০)

এতৎসত্ত্বেও ছবিকে স্বাভাবিক জীবনে অভ্যস্ত করবার জন্য নানাভাবে প্রয়াস পায় জাহেদ। একজন হৃদয়বান শিল্পীর দৃষ্টিকোণে সে সবকিছু বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়। তাদের পারস্পরিক কথোপকথন লক্ষণীয়:

> ছবি ঢোক গিলে বলল, এতকিছু যে বললাম তুমি কিছু মনে করনি? আমাকে খারাপ ভাবনি?ও! পাগল! আমি হেসে উঠে বললাম, এতে মনে করার কি আছে! সাধারণ ব্যাপার! কতই ঘটে থাকে! তাছাড়া তোমার তো কোনো দোষ ছিল না ! এজন্য তোমাকে খারাপ ভাবব ? (*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ৫৮)

ষাটের দশকে নগরজীবনের সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের উপন্যাসে লক্ষ করা যায় ব্যক্তিমানুষের তথা নর-নারীর দাম্পত্যজীবনের কঠিন বাস্তবতা। মানবজীবনের অতি-সূক্ষ্ম আন্তঃমানবিক সম্পর্ক নির্মাণে ঔপন্যাসিক এ উপন্যাসে প্রাজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। আধুনিক জীবনভাবনা ও বক্তব্যের প্রকাশ-পরিচয়ে আলাউদ্দিন আল আজাদের *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* যেন পালাবদলের নব সূচনা। এ উপন্যাসে প্রেমের টানাপড়েন, দ্বান্দ্বিকতা, হতাশা ও সংশয় কাটিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে প্রবল আশাবাদ।

চিত্রশিল্পী জাহেদ প্রারম্ভিক পর্যায়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে বিদ্ধ হলেও শেষ পর্যায়ে সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছে। স্ত্রী ছবি ও টুলটুলের টানে চার দিনের মাথায় করাচি থেকে বাড়ি ফিরে আসে সে। জাহেদের গৃহে প্রত্যাবর্তনের দিকটি ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন এভাবে:

> নগরীতে ফেলে এসেছি কুটিলতা, আকাশে উড়িয়ে দিয়েছি দুশ্চিন্তা এবং এখন যা আছে তা হল নদীতে ডুব দিয়ে গা জুড়িয়ে নেয়ার আকণ্ঠ আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ভাবারও সময় নেই। (*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ৭২)

'আলাউদ্দিন আল আজাদ এত উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের রীতি, এবং আত্মমগ্ন চেতনার ব্যক্তিক শূণ্যতার যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন, তার মাধ্যমে বাংলাদেশের উপন্যাসে আধুনিকতার প্রকাশ ঘটে। লক্ষ্যণীয়, উপন্যাসের নায়ক একজন চিত্রশিল্পী এবং শিল্পীর জীবন নিয়ে এটিই সম্ভবত বাংলাদেশের প্রথম উপন্যাস যাতে জীবন ও শিল্পের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে।'[১]

শিল্পী জাহেদের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বের মীমাংসা ও সাফল্যের নিপুণ বিশ্লেষণ *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*। জাহেদের চেতন-অবচেতনলোকে আত্মজিজ্ঞাসার ও আত্ম-উত্তরণের শিল্পরূপ এ উপন্যাস। বিজ্ঞানসম্মত আত্মবিশ্লেষণ সূত্রে জাহেদ অনুভব করে –

> আমি ওকে ভালোবেসেছি কিনা এটাই প্রশ্ন। যদি বেসে থাকি তাহলে এতটুকু ক্ষমা করতে পারব না? বিশেষত, এ যখন একটা দুর্ঘটনা মাত্র, যার আবর্তে সে একান্ত অসহায় ছিল? (*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ৫৭)

এভাবেই শিল্পী জাহেদের আত্ম-উত্তরণ ঘটে। 'আরভিং স্টোনের *দ্য লাস্ট ফর লাইফ* উপন্যাসের নায়ক শিল্পী ভ্যান গখের দৃষ্টিতেও নারীর অন্তরময় সত্তার স্বীকৃতি লক্ষ করি। নিষিদ্ধ পল্লীর সাধারণ এক মেয়ের মধ্যে নিজ পৌরুষের পরম চরিতার্থতা খুঁজে পেয়েছিলেন ভ্যান গখ। আলাউদ্দিন আল আজাদ ইউরোপীয় মূল্যবোধ ও জীবনবিন্যাসের সঙ্গে বাঙালি জীবনের নারীভাবনার সমীকরণ ঘটিয়েছেন এ- উপন্যাসে।'[২]

তেইশ নম্বর তৈলচিত্র উপন্যাসে জাহেদ ও ছবির জীবনাখ্যান উপস্থাপনের সমান্তরালে জামিল-মীরা বৌদি, জোবেদাখালা-আহাদ মিয়া, মজুতবা-টিনা প্রমুখ চরিত্রের কাহিনি উপন্যাসটিকে সমৃদ্ধ ও গতিময় করে তুলেছে। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের উপস্থিতি উপন্যাসটিকে প্রদান করেছে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা। শিল্পী জামিল ও মীরা বৌদির দাম্পত্যসংকট, দারিদ্র্য, অহংবোধ, নিঃসঙ্গ ও একাকিত্ব জীবনের অবসান ঘটিয়ে পুনরায় দাম্পত্যজীবনে

---

[১] আহমেদ মাওলা: *বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে প্রবণতাসমূহ*, প্রথম প্রকাশ: জুন ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ১৯

[২] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস :* বিষয় ও শিল্পরূপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬-১৫৭

প্রত্যাবর্তনের দিকটিও উন্মোচিত হয়েছে উপন্যাসে। জামিল চৌধুরীর সঙ্গে তার সহপাঠিনী মীরা দাশগুপ্ত প্রণয়সূত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু তারা দুবছর ধরে দাম্পত্যজীবন-বিচ্ছিন্ন। দুটি সন্তান থাকা সত্ত্বেও তারা পরস্পরের দূরবর্তী। অবশেষে জামিলের অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে মীরার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ এবং পরিশেষে মীরার ভালোবাসার কাছে পরাভব স্বীকার উপন্যাসটিকে প্রদান করেছে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা। আলাউদ্দিন আল আজাদ নর-নারীর ব্যর্থপ্রেমকে এভাবে সার্থক প্রেমে রূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছেন। একটি দৃষ্টান্ত :

> কে? কে ওখানে? দরজার কাছে মীরা ফিরে দাঁড়াতেই আবার জোরে উচ্চারণ করলেন জামিল, কে?... কিছুক্ষণ চেয়ে দেখার পর জামিল ভাই ত্রস্তভাবে খাটের ওপর থেকে নামলেন, ছুটে গিয়ে ব্যাকুল গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বলতে থাকেন, মীরা! আমার মীরা আমাকে রক্ষা কর, মীরা আমি নিঃশেষ হয়ে গেছি আমাকে বাঁচাও! (*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ৩৮)

জোবেদা ও আহাদ মিয়ার দাম্পত্যজীবন-বিচ্ছিন্নতার একমাত্র কারণ জোবেদা খালার অর্থ ও সম্পদের প্রতি লোভ-লালসা। দরিদ্র স্কুল শিক্ষক আহাদ মিয়াকে ছেড়ে জোবেদা খালা বিয়ে করেন একজন মাদ্রাজি ব্যবসায়ীকে। আহাদমিয়া স্বেচ্ছায় জোবেদাকে তালাক দেননি বরং জোবেদা স্বেচ্ছায় তাকে ছেড়ে চলে যান। জোবেদার কাছে আহাদ মিয়ার প্রেম ছিল গৌণ, মুখ্য ছিল ধন-দৌলত বিত্ত-বৈভব। অঢেল বিত্তের মধ্যে বসবাস করেও জোবেদার জীবনে ছিল না শান্তি ও স্বস্তি; বরং নিঃসঙ্গতাই হয়ে ওঠে তার একমাত্র অবলম্বন। সমুদ্র সৈকত ম্যানোরায় জোবেদা খালাকে জাহেদ প্রশ্ন করেছিল –

> আচ্ছা, আহাদ সাহেবকে আপনার মনে পড়ে না? (*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ১৯)

তখন জোবেদা খালা আনমনা ও বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তার আচার-আচরণে ধরা পড়ে বিচ্ছিন্নতার এক করুণ চিত্র:

> একটা চোরাবালির ধ্বস বুঝি নিচে ডেবে গেল আচমকা। ... আর্তনাদের মতো একটা অস্ফুট শব্দ করে জোবেদা খালা বসে পড়লেন শুধু। ... একেবারে নির্বাপিত শীতল কণ্ঠস্বর। ... দুই চোখ বেয়ে দর্‌দর্‌ ধারায় পানি গড়িয়ে পড়ছে। (*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ১৯)

জোবেদার পিতা ছিলেন স্কুল শিক্ষক। বাবার আদর্শ অনুসরণ করে জীবন-যাপন করতে চায়নি সে। অর্থবিত্তই ছিল তার জীবনের পরম আরাধ্য। কিন্তু শেষাবধি দেখা যায় ধন-দৌলতের কাছে নয়, ভালোবাসার কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছে তাকে।

মুজতবা চরিত্রে প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হয়েছে অস্বাভাবিক আচরণ, বিকারগ্রস্ততা ও রুচিহীনতা। মুজতবা-টিনার সম্পর্কের মধ্যে মজবুত কোনো ভিত্তি নেই, আছে আদিম মানবিক অনুভব। দাইলাউংফার একমাত্র মেয়ে টিনা। ভালোবাসার সূত্রে মুজতবা-টিনার সম্পর্ক হয়ে ওঠেনি। টিনার প্রেম ছিল –

> চুংমুংলে'র সুমুখে এক শুকর তিন মুর্গি বলি ... (*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ৬৫)।

টিনার প্রেমকে মুজতবা কখনও মন থেকে মেনে নিতে চায়নি, বরং প্রতারণা করেছে সে। মুজতবা-টিনার প্রেমের পরিণতি ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় নির্দেশিত হয়েছে এভাবে–

> শাহাদাৎ নির্বিকার আমাকে থামিয়ে দিয়ে শান্ত গম্ভীর স্বরে বলল, দরকার নেই। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দে! তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনি নিঝ্‌ঝুম আকাশের তলে রাতের অন্ধকারে অরণ্যে নদীতে পাহাড়ে পাহাড়ে একটা ডাক ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে যাচ্ছে, তি-না! (*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*,পৃ. ৬৭)

আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাসে বিষয়চেতনায় যে বিশেষত্ব নজরে পড়ে, তা হচ্ছে মানবমনের অন্তর্বিশ্লেষণ ও ফ্রয়েডীয় লিবিডোর উপস্থিতি। বিষয়ের দিক থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুসরণ করলেও শিল্পের দিক থেকে তিনি অনেকটা প্রথাগত।'ফর্ম বা রীতির দিক থেকে *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*-এর কোনো অভিনবত্ব নেই, কিন্তু বিষয়ের দিক থেকে তার নতুনত্ব অনস্বীকার্য, অন্তত বাংলাদেশের তৎকালীন সাহিত্য রুচির প্রেক্ষাপটে।'[১]

*তেইশ নম্বর তৈলচিত্রে*র ঘটনাবিন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ। উপন্যাসে প্রকরণশৈলী নির্মাণে লেখক ছিলেন অনেকটা উদাসীন। কাহিনিকে গতিময় ও প্রাণময় করার লক্ষ্যে তাঁর ভাষা যথেষ্ট উপযোগী। এটি লেখকের প্রথম উপন্যাস। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের বক্তব্য:

> আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর এ– উপন্যাসে প্রথাগত ফর্মের মধ্যেই নব-আঙ্গিকের নিরীক্ষা করেছেন। বিশেষ করে, চরিত্রচেতনা–অনুষঙ্গী ইম্প্রেশন ও সংলাপ সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতা সন্দেহাতীত।[২]

আলাউদ্দিন আল আজাদ কেন্দ্রীয় চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাসটি নির্মাণ করেছেন। *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* দশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত একটি উপন্যাস। উপন্যাসে ব্যক্তিমানুষের

---

[১]আহমেদ মাওলা: *বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে প্রবণতাসমূহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

[২] রফিকউল্লাহ খান: *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

সংকট, জটিলতা ও পরিণাম নির্ধারণে ঔপন্যাসিকের পারদর্শিতা চমৎকার। তাঁর এই উপন্যাসটি আত্মকথনের ঢঙে উপস্থাপিত হয়েছে। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ দশটি পরিচ্ছেদে শিল্পী জাহেদের শিল্পীজীবনের ঘটনা আত্মকথন ভঙ্গিতে রূপায়িত হয়েছে। এ উপন্যাসে লেখকের শিল্পসৌন্দর্যবোধের উদ্বোধন বিস্ময়কর। প্রেম ও লিবিডো বিষয়ে তাঁর বর্ণনা আকর্ষণীয়। উপন্যাসে ১ম পরিচ্ছেদে থেকে ১০ম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ব্যবহৃত শব্দ, বাক্যবিন্যাস, সংলাপ ও অলংকার ব্যবহারে তিনি বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন।

উপন্যাসে লেখক জীবনবাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উপমা-অলংকার ব্যবহার করেছেন:

১. ত্রিকোণ সিঁড়ি-বারান্দা, দেয়ালে গাঁথা ফিতের মতো ফুলের চাতাল। অবশ্য নকল মুক্তোর মতো, তবু রুচির ছাপ তোআছে খানিকটা ? (*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, *পৃ.* ১৭-১৮)

২. ভেতরটা সত্যি প্লাবিত হয়ে গেছে শরবনে নিশুতি রাত্রির নিঃশব্দ জোয়ারের মতো। (*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ২৭)

৩. হায় রাধার মতো মেয়েরা ভালোবাসতে জানে না আর। (*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ২৮)

৪. কোমল কোরকের মধ্যে পদ্মের মতো ওর নিটোল দেহখানি নিবিড় সৌরভে ঘেরা। (*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ৪৬)

৫. ছবির মুখখানা একটি ফুৎকারে বাতির শিখা নিভে যাওয়ার মতো একেবারে রক্তহীন, সে যেন কাঁপছে মৃগীরোগীর মতো। (*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ৫৩)

৬. দূরে পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে বেগুনী মেঘের মতো। (*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ৬২)

৭. চিলের ডাকের মতো সাহেবের চিৎকার শুনে মাজু মিঞা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেল। (*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ৬৫)

৮. ছায়ামূর্তির মতো একটা লোক দুতিনবার প্রাঙ্গণে ঢুকবার চেষ্টা করেছে। (*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ৬৬)

তেইশ নম্বর তৈলচিত্র উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের বর্ণনা মনোবিশ্লেষণাত্মক। সংলাপ নির্মাণে তিনি স্বাক্ষর রেখেছেন বিশ্লেষণধর্মিতার। একটি দৃষ্টান্ত:

> নারী জীবনের সার্থকতা কোথায়? নারীর জীবন কি প্রেম অথবা মাতৃত্ব? প্রেম ছাড়াও মাতৃত্ব সম্ভব; কিন্তু মনে হয় প্রেমের মধ্য দিয়ে যে মাতৃত্ব সেখানেই রয়েছে সত্য। (*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ৫৯)

উপন্যাসে চরিত্রপাত্রের অবস্থা ও অবস্থানকে স্পষ্ট করার জন্যে লেখক ব্যবহার করেছেন ইংরেজি সংলাপ। একটি দৃষ্টান্ত:

১. রিয়্যালী ইট ইজ মাচ এনকারেজিং দ্যাট নিউ ট্যালেন্টস্ আর কামিং ফরওয়ার্ড টু এনরিচ্ দিস্ ফিল্ড অব্ ন্যাশনাল গ্লোরী। (*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ১৫)

উপন্যাসের ঘটনাকে আরও ব্যঞ্জনাময় ও বৈচিত্র্যধর্মী শিল্পরূপময় করে উপস্থাপনের জন্য লেখক প্রকৃতি ও নিসর্গের ব্যবহার করেছেন। এতৎ প্রসঙ্গে দুটি দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়:

১. মেঘ যখন কেটে গেছে তখন সারা পৃথিবীই আলোকিত হবে সোনালী রূপালী ধারায়। গাছের পাতারা নাচবে, গান গাইবে পাখি। (*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ৩৯)

২. চাঁদটা আরো একটু সরে গেছে আকাশের কোলে, গাছের পাতাগুলো লুকোচুরি খেলছে জোছনার সঙ্গে। ধীরে ধীরে একখণ্ড বেগুনীমেঘ এসে চাঁদকে গ্রাস করে ফেলে, তাই ডুবে গেল জানালা এবং ঘরের ভেতরটা আরো একটু অন্ধকার হয়ে এল! (*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, পৃ. ৪৭)

উপন্যাসটি ঘটনাপ্রধান নয়, চরিত্রপ্রধান। এই উপন্যাসে চরিত্রের সংখ্যা স্বল্প। গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রসমূহ হচ্ছে শিল্পী জাহেদ, ছবি, জামিল চৌধুরী ও মীরা। পার্শ্বচরিত্রে দেখা যায় জোবেদা খালা, জাহেদের বন্ধু চিত্রকর মুজিব, আমেদ ও রায়হান, আহাদ সাহেব, জহু, জাহেদের বন্ধু মুজতবা, টিনা, রাধা, নোটন, শিউলি, মিন্টু, টিনার বাবা ছাইলাউংফা, বন্ধু শাহাদাৎ, টুলটুল, মিস সারা আহমেদ ও ক্যাপ্টেন প্রমুখ।

এ উপন্যাসে করাচি, ঢাকা ও চট্টগ্রামের পাহাড়ি পরিপ্রেক্ষিত ব্যবহৃত হয়েছে। উপন্যাসটি লিখিত হয়েছে চলিত গদ্যে। উপন্যাসটিতে সময়ের সীমা সংক্ষিপ্ত ও সংহত।

'ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের প্রভাবে উপন্যাস অগ্রসর হয়েছে ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার বিশ্লেষণে। এইসব নূতন পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য উপন্যাসের উপস্থাপনার ভঙ্গিতেও এসেছে বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব। স্বগতোক্তি বা আত্মকথন (Interior monologue), আনুষঙ্গিক ভাবপ্রবাহ (Free association), অতীত প্রক্ষেপণ (Flash back), এলোমেলো মানসিক ভাষণ (Mental prattle), তির্যক বাগভঙ্গি বা বক্রোক্তি (Oblique writing), বহুকৌণিক দৃষ্টিভঙ্গি (Multiple view), সন্নিকট দর্শন (Close up), প্রভৃতি কলাকৌশল নূতন আঙ্গিক প্রকাশে ব্যবহৃত হয়'।[১] উপন্যাসে চেতনাপ্রবাহরীতি অনুসৃত হয়েছে প্রেমানুষঙ্গিক বর্ণনার সূত্রে। বলা বাহুল্য, ফ্রয়েডীয় অবচেতনা ও যৌনবোধকে বিষয়রূপে গ্রহণ করার প্রবণতা উপন্যাসটিকে করে তুলেছে ভিন্নস্বাদী।

[১]শাহীদা আখতার, *পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

আলাউদ্দিন আল আজাদ এ উপন্যাসে ব্যক্তিসম্পর্কের টানাপড়েন কিংবা এক বা একাধিক চরিত্রের অভিঘাত দেখিয়েছেন। নাগরিক দাম্পত্যজীবনের জটিলতা ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ অভিব্যক্ত হয়েছে অনন্য মাত্রায়। উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্তের আবেগ ও রোমান্টিক প্রবণতার প্রতিফলন ঘটালেও তা মীমাংসিত হয়েছে পাশ্চাত্য ভাবধারায়।

তেইশ নম্বর তৈলচিত্র আলাউদ্দিন আল আজাদের শিল্পী জীবনের প্রথম উপন্যাস। কিন্তু এই উপন্যাসে প্রথাগত রচনারীতি অনুসৃত হলেও বিষয়ের দিক থেকে এটি যে সমকালীনতার সীমা অতিক্রমে সক্ষম হয়েছে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন

আলাউদ্দিন আল আজাদের *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন*[১](১৯৬২) উপন্যাসটি একজন বিধবা নারীর অন্তর্জগতের অন্তর্ময় আলেখ্য। সাঁইত্রিশ বছরের প্রৌঢ় বিলকিস বানুর কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা-অচরিতার্থতা, নিঃসঙ্গতা ও যন্ত্রণাদগ্ধ বাস্তবতা এ উপন্যাসে উন্মোচন করেছেন ঔপন্যাসিক। 'নাগরিক মধ্যবিত্ত মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও বিকৃতির কিছু চিত্র আছে এসব উপন্যাসে। কাহিনীর শেষে জীবনের সুস্থতায় উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত।'[২]

উপন্যাসটির ঘটনাংশ উন্মোচিত হয়েছে বিলকিস বানুর অন্তর্জাগতিক নিঃসঙ্গতাকে উপলক্ষ করে। বিধবা বিলকিস বানু একজন শিক্ষিত নারী। পনের বছর বয়সে তার বিয়ে হয়েছিল এক চামড়া ব্যবসায়ীর সঙ্গে। বিলকিস ছিলেন ওই ব্যবসায়ীর দ্বিতীয় স্ত্রী। তাদের স্বল্প দাম্পত্যজীবনে বিলকিস বানুর অনিচ্ছায় জন্ম হয়েছিল খোকন ও পারভিনের। বিবাহিত জীবনে স্বামীর প্রতি আন্তরিক প্রেমানুভবে কখনোই জেগে ওঠেননি বিলকিস। অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বামীর সঙ্গে তার সম্পন্ন হয়েছিল দৈহিক মিলন। স্বামীর মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে তার প্রতি ভালোবাসা জন্মেছিল বিলকিস বানুর। এতৎ প্রসঙ্গে বিলকিস বানুর আত্ম-অনুভব লক্ষণীয়:

---

[১]আলাউদ্দিন আল আজাদ, '*শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন*', শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ২০০১, গতিধারা, ঢাকা। বর্তমান গ্রন্থে '*শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন*' উপন্যাসের পাঠ এ সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে। উপন্যাসটি চলন্তিকা পত্রিকার ঈদসংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত (১৯৫৯) হয়।

[২]শাহীদা আখতার, *পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

> এখন ভাবলে একটু মায়া হয় বৈকি! লোকটা ছিল অতৃপ্ত অসহায় বোবা পশুর মতো, যৎসামান্য আদর দিলেও পায়ের কাছে গোলাম হয়ে থাকত। কিন্তু বিলকিস তা দিতে পারেননি। চামড়ার ব্যবসায়ী, গায়ের একটা কুৎসিত দুর্গন্ধ যেন মাখা। (শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন, পৃ. ৮৪)

'তার স্বামী অনেকটা রবীন্দ্রনাথের *যোগাযোগ* উপন্যাসের মধুসূদন ঘোষালের মতো – সম্পদশালী অথচ অমার্জিত, অশিক্ষিত, অসংস্কৃত। এমন অর্থলোভী ও মাংসগৃধ্নু পুরুষের হাতে পরে বিলকিসের শিক্ষিত যৌবনটাই ব্যর্থ হয়ে যায়।'[১] স্বামীর মৃত্যুর পর দুই সন্তান খোকন ও পারভিন এবং পরিচারক গফুরকে নিয়েই সচ্ছল জীবন-যাপন করছিল বিলকিস। মৃত স্বামীই তাকে দিয়ে গেছে অঢেল সম্পদ ও যথেষ্ট আর্থিক সুবিধা। অথচ স্বামীর জীবদ্দশায় তার কথা কখনও ভাবার চেষ্টা করেনি সে। দাম্পত্যজীবনের প্রথমাবধি স্বামীকে অবহেলা করে এসেছিল সে।

স্বামীর মৃত্যুর পর সে হয়ে গেছে একা, নিঃসঙ্গ ও বন্ধুহীন। বিলকিস বানুর নিঃসঙ্গতার পরিচয় এভাবেই বিধৃত হয়েছে উপন্যাসে:

> বিলকিস নিঃসঙ্গ, পাতা শুকিয়ে যাওয়া ঐ ঝাউগাছটার মতোই একা। (শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন, পৃ. ৮০)

বিবাহিত জীবনে স্বামীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক ঘটলেও মনের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। স্বামীর মৃত্যুর পর তার কামনা-বাসনা প্রকাশ পেয়েছে তার বড়ো মামাতো বোনের ছেলে কামালকে উপলক্ষ করে। কামালের সঙ্গেই তার মেয়ে পারভিনের বিয়ে পাকাপাকি হয়েছে। কিন্তু 'সাঁইত্রিশ বছর বয়সী বিলকিস অসহায়ের মতো অনুভব করছে তার নিজ সন্তানতুল্য যুবাপুরুষ কামালের সান্নিধ্যে এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে জেগে উঠছে তার নিজ নারীত্ব।'[২]বিলকিস তার মনের অবচেতন-স্তরে অনুভব করেছে কামালের সান্নিধ্য। কামালের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটেনি। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে বিলকিস জীবনবাস্তবতায় এক কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বিলকিস বানু কামালকে আপন করে পেতে চায়, কিন্তু মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তারই মেয়ে পারভিন। তিনি নিজেই মেয়ের বিবাহ ঠিক করে রেখেছিলেন। 'পারভিন-কামালের বিবাহপূর্ব ঘনিষ্ঠতার

---

[১]রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

[২]মুহম্মদ মুহসিন, 'আদর্শবাদের অস্বস্তিতে আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস', মাঘ ১৪১৭, *মাসিক উত্তরাধিকার*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৩৮

প্রেমময় প্রকাশ প্রত্যক্ষ করে দগ্ধীভূত হয় বিলকিসের নিঃসঙ্গ আন্তর্লোক।'[১] নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের জটিল মনস্তত্ত্ব ও আত্মসংকটে পরাভূত বিধবা নারী বিলকিস বানু। তাঁর অন্তর্যন্ত্রণা, নিঃসঙ্গতা ও আত্মমুক্তিই হয়ে উঠেছে এ উপন্যাসের উপজীব্য। উপন্যাসের প্রারম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বিলকিস বানুর জীবনের নিঃসঙ্গতা, শূন্যতা, একাকিত্ব, বিচ্ছিন্নতাবোধ ও আত্মমুক্তির প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

শান্তিনগরের গাছপালাবেষ্টিত নিজ বাড়িতেই সময় কাটে বিলকিস বানুর। নিজ সন্তান খোকন বাড়িতে থাকে না বললেই চলে। অপর সন্তান পারভিনের সময় কাটে কলেজে। বাড়ির তদারকি করতেই সময় চলে যায় পঁয়তাল্লিশ বছরের চাকর গফুরের । সুতরাংবিলকিস বানুর জীবনের শূন্যতাটুকু আর কারও সঙ্গে সহভাগিতা করার সুযোগ হচ্ছিল না। উপন্যাসে লক্ষ করা যায়, বিলকিস বানুর নৈঃসঙ্গ্যানুভূতির তীব্র দহন, অন্তর্যন্ত্রণা এবংএকই সঙ্গে নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষার এক প্রচেষ্টা। বিলকিস বানুর নিঃসঙ্গ অনুভূতির আরও একটি দৃষ্টান্ত:

> অদ্ভুত এই একাকিত্বের স্বাদ। যতই সময় যায় আস্তে আস্তে নিজেকে মনে হয় অন্যজন। বাইরের খোলসগুলো একে একে সরে পড়তে থাকে, মুখোশের আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়ে আসল মুখখানা। (*শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন*, পৃ. ৮৫)

এই উপন্যাসে লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নারী হৃদয়ের যন্ত্রণাকে চিহ্নিত করেছেন। বিলকিস বানু সন্তান জন্মদান করলেও তাদের প্রতি তার মনের টান ছিল না বললেই চলে। ছেলে খোকনকে কখনও কাছে পাওয়ার সুযোগ তাঁর ছিল না। একরকম মনের বিরুদ্ধে খোকনকে জন্মদান করেছিল বিলকিস। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য:

> ছেলেদের প্রতি মা'য়ের টান বেশি, এতো চিরন্তন রীতি; অথচ খোকনকে কোনদিন বিশেষ সহ্য করতে পারেন নি। বরং ওর প্রতি একটা জটিল বিতৃষ্ণা। এতদিনে স্পষ্ট হয়েছে, ও তো রীতিমতো অবৈধ সন্তান। ... পাশবিকতা থেকে যার জন্ম, আইন-সঙ্গত স্বামীর ঔরসজাত হলেও, সে অবৈধ ছাড়া আর কী? (*শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন*, পৃ. ৭৭)

বিলকিস বানুর ভাবনা ও উচ্চারণে প্রতিফলিত হয়েছে নিঃসঙ্গতার প্রতিচ্ছবি। সপ্তাহে তিনদিন স্কুলে সময় কাটলেও তার বাকি সময়টুকু কাটে অলসতার মধ্য দিয়ে। কন্যা

[১] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

পারভিন কলেজ নিয়ে ব্যস্ত, ছেলে খোকন সারাদিন বাসায় থাকে না বললেই চলে, গফুর রান্না-বান্না, বাজার নিয়েই ব্যস্ত থাকে। ফলে বিলকিস বানু এক নিঃসঙ্গ মানুষ হিসেবেই দিনগুলো অতিবাহিত করে।

ঘটনাক্রমে বিলকিস তার বড়ো মামাতো বোন জেবু আপার মেজো ছেলে কামালের সঙ্গে নিজ কন্যা পারভিনের বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। এতৎপ্রসঙ্গে বিলকিস জেবু আপাকে চিঠিতে তাঁর ইচ্ছার কথা জ্ঞাপন করেছিলেন এভাবে:

> কথাটি হল আমার মেয়ে পারুর বিয়ে। জানেন তো বড় আদর দিয়ে মানুষ করেছি। অজানা অচেনা জায়গায় তুলে দিতে ইচ্ছা হয় না। যদি কিছু মনে না করেন বলতে পারি, আপনার মেজো ছেলে কামালকে আমার খুব পছন্দ। ... দুটিতে মানাতো বেশ। অবিশ্যি ছেলেকে ... চালিয়ে নেওয়া হয়তো কঠিন হবে না। (*শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন*, পৃ. ৭৮)

বিলকিস বানু কখনোই চাননি যে তাঁর ইচ্ছার বলয় থেকে পারভিন দূরে সরে যাক। অন্যদিকে কামাল-পারভিনের প্রেম সম্পর্ক প্রত্যক্ষণসূত্রে কামালের প্রতি নিজেই জেগে ওঠেন প্রেমকামনায়।পনের বছর বয়সে যে প্রেম-ভালোবাসা দিতে পারেননি প্রিয় স্বামীকে, মনের অবচেতন স্তরে লুকিয়ে থাকা সেই ভালোবাসাই কামালকে দিতে চান বিলকিস বানু। কামালের সান্নিধ্য-সঙ্গই নিঃসঙ্গ বিলকিসকে নতুন স্বপ্নের দিকে ধাবিত করে। 'লিবিডোর তাড়না এবং সুপার ইগোর নিয়ন্ত্রণের দ্বন্দ্ব ক্ষতবিক্ষত করে দেয় বিলকিসের অন্তর্জগৎ।'[১]

পনের বছর বয়সে বিলকিস বানুর বিবাহ যখন হয়, তখন মন-মানসিকতার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অপরিপক্ক। স্বামী জীবিত থাকাকালে তাঁর কামনা-বাসনা ছিল অতৃপ্ত। কিন্তু স্বামীর মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে বিধবা বিলকিসের সুপ্ত যৌনাকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে কামালকে উপলক্ষ করে। বিলকিস বানু জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা থেকে বেরিয়ে আশ্রয় খোঁজে কামালকে অবলম্বন করে। 'অতৃপ্ত জীবন, অতৃপ্ত প্রেম আর অতৃপ্ত যৌন ক্ষুধার তাড়নায় একদিন গভীর রাতে পারভিন সেজে সে মিলিত হয় কামালের সাথে। বিচিত্র সুখানুভূতিতে শিহরণে তার দেহ মন রোমাঞ্চিত হয়।'[২] এক অদ্ভুত শিহরণে জেগে ওঠে দেহ ও মন। একটি দৃষ্টান্ত:

---

[১]রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

[২]ফরিদা সুলতানা, *বাংলাদেশের উপন্যাসে জীবন চেতনা*, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৯, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ ২০৮

না, না, আর নয়, আর দ্বিধা নয়, আর সংকোচ নয়। তিনি দেবেন, সব দেবেন। সকল পলায়নের আড়াল থেকে তুলে নিয়ে নিজেকে উন্মুক্ত করে ধরবেন। বলবেন, ওগো চিনতে পারছো না? অন্য কেউ নয়, আমি আমি আমি তোমার, আমাকে নাও।

শিউরে উঠবে? উঠুক একবার। কাঁপতে থাকবে? কাঁপুক শতবার। আত্মপ্রকাশ একবার হয়ে গেলে পর পরম সাহসে একাগ্র হয়ে যাবে দেহমন। কথা বলতে পারবে না সে, মূক হয়ে যাবে, আর তখন তাঁকে পরিস্থিতির পুতুল বানাতে কতক্ষণ? হাত ধরে নিয়ে চৌকির ধারে বসালে টেনে নিবেন কোলের ওপর। মাথার চুলে আদর করতে থাকবেন, হাত বুলিয়ে এরপর ও চাইলে ঠোঁটের মধ্যে ঠোঁট ডুবিয়ে মিশে থাকবেন, মিশে থাকবেন, মিশে থাকবেন। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলুক রাত শেষ হয়ে যাক, গান গাক, সকাল হোক লোকজন জড়ো হয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখুক রোদ আসুক বসন্তের পরে গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পরে বর্ষা, বর্ষার পরে আবার শীত; জন্মের পর শৈশব, শৈশবের পর কৈশোর, কৈশোরের পরে যৌবন, যৌবনের পরে প্রৌঢ়ত্ব, প্রৌঢ়ত্বের পরে বার্ধক্য, বার্ধক্যের পরে প্রলয়, প্রলয়ের পরে সমাধি, সমাধির পরে পরলোক; পরলোকের পর প্রলয়, প্রলয়ের পর বিচার, বিচারের পর স্বর্গ, না না স্বর্গ নয়, স্বর্গ নয় নরক, অনন্ত নরক যাই হোক, এই একটি চুম্বনের যেন সমাপ্তি না ঘটে। (*শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন*, পৃ. ১৩৫-১৩৬)

এভাবেই বিলকিস বানুর অবচেতন মনে তরঙ্গায়িত হয় প্রবল যৌনাকাঙ্ক্ষা, মিলনের অদম্য বাসনা ও অসামাজিক প্রেমের দুঃসাহসী পরিকল্পনা। আরও একটি দৃষ্টান্ত:

ওগো স্বপ্ন আমার, আমার চোখের মণি, হৃদয়ের ধন। আমি রিক্ত, আমি নিঃস্ব, নবীন দেবতা, আমাকে তুমি তোমার দানে ভরে তোলো। আমাকে শ্রান্ত করে চোখ বুঁজিয়ে, ঘুম পাড়িয়ে দাও। (*শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন*, পৃ. ১৩৬)

কামালকে ঘিরে বিলকিসের বাসনালোলুপতার অবশেষে মৃত্যু ঘটে। যে আশা করে কামালের ঘরে প্রবেশ করতে চেয়েছে, সে ঘরেই তার মেয়ে পারভিন অভিসারে ব্যস্ত। মেয়ে পারভিনের সঙ্গে কামালের প্রেমাভিসারের দৃশ্য বিলকিস বানু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে।অতঃপর বিলকিস আক্রান্ত হয় সত্তাশূন্যতার অন্তহীন যন্ত্রণায়, শূন্যতাবোধে। একটি দৃষ্টান্ত:

বিলকিস হাসছেন, সাগ্রহে আগলে ধরে দুধের মতো ফকফকে দাঁতগুলো বার করে হাসছেন। আস্কারা পেয়ে ক্রমে বেড়েই চলে ওদের দুরন্তপনা, আর বিলকিস আরো হাসছেন। হাসতে হাসতে তার দুচোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল। প্রথমে দুই বিন্দু; কিন্তু পরে সেই হল অবিরল অশ্রুধারা। ছোটদের দুর্বার আলিঙ্গনের মধ্যে সেই অশ্রু সবুজ ঘাসের ওপর মুক্তার মতো ঝরে পড়লো।(*শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন*, পৃ. ১৪০)

বিবাহিত জীবনের অতৃপ্তিই বিলকিস বানুকে নিঃসঙ্গ করেছে। নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবেই বিলকিস অবচেতন মনে বেছে নিয়েছে কামালের সান্নিধ্য। কিন্তু বহির্বাস্তবতার কারণে অন্তর্যন্ত্রণা থেকে বিলকিস কখনোই মুক্তি পায়নি। বরং অন্তিমে উপলব্ধি করেছে ধর্মবাণী। একটি দৃষ্টান্ত:

> অনেকদিন ভুলে যাওয়া ছোট্ট স্মৃতির মতো একটি জিনিসের কথা মনে পড়লে উঠে গেলেন। বিয়ের সময় মায়ের দেওয়া একটি ছেটো আকারের কোরান শরীফ, বাক্স খুলে বার করলেন সেটা। এতে আছে অমৃত বাণী, শান্তি সুধা, কোনদিন ছুঁয়েও দেখেন নি। (*শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন*, পৃ. ১৪০)

মূলত উপন্যাসে বিলকিস বানুর প্রেমহীন দাম্পত্যজীবন ও কামজ লিপ্সা অভিব্যক্ত হয়েছে। আধুনিক নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণির অন্তঃসারশূন্যতা আর অর্থহীন আভিজাত্যের প্রতিনিধিত্ব করেছে বিলকিস বানু। জীবদ্দশায় স্বামীর সঙ্গে নিষ্প্রাণ শীতার্ত সময় অতিবাহিত করেছে বিলকিস বানু; অবশেষে কামালের সান্নিধ্যে-সাহচর্যে জীবনে নবীন বসন্তের দোলা লাগলেও পরিশেষে অন্তহীন বেদনাই হয়ে ওঠে তার নিয়তি।

শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন উপন্যাসের প্রকরণ-পরিচর্যায় আলাউদ্দিন আল আজাদ অধিক মনোযোগী ছিলেন বলে মনে হয় না । ঘটনাংশ বয়নে লেখক বর্ণনাপ্রধান ভঙ্গি অনুসরণ করেছেন।

উপন্যাসে বিলকিস ছাড়া প্রায় প্রতিটি চরিত্র সরল, অজটিল ও বৈচিত্র্যহীন। উপন্যাসে চরিত্র সংখ্যা স্বল্প। ডাক্তার জামান, কুর্সির মা, পারভিন, খোকন, জেবু আপা, রুনু, গফুর, শফিক, মমতা – কোনো চরিত্রই অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়নি। যেহেতু এই উপন্যাসের মূল কাহিনি বিলকিস বানুর জীবনকথাকেন্দ্রিক, সেহেতু তাকে কেন্দ্র করে প্রত্যেকটি চরিত্র পল্লবিত হয়েছে।

বিলকিস বানু চরিত্রাঙ্কনে ঔপন্যাসিকের দক্ষতা বিস্ময়কর। বিলকিস চরিত্রটি ছিল ঔপন্যাসিকের বাস্তব নির্মাণ। এই চরিত্রটি একদিকে যেমন মমতাময়ী জননীর প্রতীক, অন্যদিকে তেমনি দেহকামনায় জাগ্রত নারীর প্রতিনিধি। 'স্বামীর মৃত্যুর পর দুই সন্তান নিয়ে

এক নির্বিকার আবেগহীন জীবনযাপন করে সে। বিলকিস আসলে কালোনিশাসিত সমাজের মুৎসুদ্দি-চরিত্র স্বামীর অসংস্কৃত ব্যবহারে বিক্ষত বিবর্ণ এক নারী।'[১]

শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ। উপন্যাসের ঘটনাংশ মূলত বিলকিসবানুকেন্দ্রিক। উপন্যাসের সূচনা পর্যায় থেকে অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত বিলকিস বানুকে কেন্দ্র করেই ঘটনা আবর্তিত করেছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাসে বিলকিস বানুর দাম্পত্য জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো ব্যবহৃত হয়েছে অবচেতন মনের গুহাগহ্বর থেকে। এর ফলে বর্ণনাংশ অনেক সময় হয়ে উঠেছে উল্লম্ফনধর্মী, চিত্রময় ও গীতময়। বিলকিস বানুর অন্তর্ময় দৃষ্টিকোণে নির্মিত এরকম একটি বর্ণনাংশ লক্ষণীয়:

> বাইরে গাছের পাতায় ঝিরঝিরে হাওয়া, আর সর্বত্র রোদের ঝিকিমিকি। দুপুরেও এমন একটা আমেজ জড়িয়ে আছে, গোধূলিক্ষণের সঙ্গেই যার সাদৃশ্য। জানালার বাইরে লতাঝোপে একটা টুনটুনি লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, সে আরেক প্রবাহ, যদিও ইতিহাস নেই, তবু ওদের জীবনও তো সার্থক? সার্থকতার রঙিন হয়ে ওঠবার জন্য সব খোয়াবার সময় হবে কোন্ সকালে? গান শেষ হলে বিলকিস মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন খানিকক্ষণ, এরপর বললেন, বাঃ! চমৎকার গাও তো তুমি? (*শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন*, পৃ. ১০৮)

'প্রচলিত ফর্ম-অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও আলাউদ্দিন আল আজাদের *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন* মনোসংকট ও মনোবিশ্লেষণের নৈপুণ্যে আঙ্গিকগত অভিনবত্ব অর্জন করেছে।ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উন্মোচনে ঔপন্যাসিকের সংযম ও সংহতি বিস্ময়কর। রতিবাসনা (Libido) ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দ্বন্দ্বক্ষত পরিস্থিতির চাপে বিলকিসের অন্তর্গত রক্তপাতকে বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যায় উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। রিক্ত ও শূন্যযৌবনের অন্তরিত দীর্ঘশ্বাস রূপায়ণে অন্তর্গত স্বগতকথনরীতির (interior monologue) ব্যবহারও এ-উপন্যাসে শিল্পসার্থকতা লাভ করেছে।'[২] যেমন:

> এই আকাশ, ঐ তারা ছায়াপথ. আমার কাছে বিস্ময়ের মতো ঠেকে। এরা গভীর, এরা অনন্ত। এরা যদি আদিকাল ধরে জেগে থাকতে পারে প্রেম কেন জেগে থাকবে না। (*শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন*,পৃ. ৯৯)

---

[১] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

[২] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস, বিষয় ও শিল্পরূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১

ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন রীতির প্রয়োগ উপন্যাসে লক্ষণীয়। মানুষের গুহায়িত যৌনক্ষুধার অমোঘ নিয়তি বিলকিস বানু, এবং তার অন্তর্গূঢ় যৌনক্ষুধা ও জৈবচেতনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে সন্তানতুল্য কামালকে ঘিরে। একটি দৃষ্টান্ত:

> বিলকিস বাঁ হাতের তালু দিয়ে বাঁ চোখটা কচলাচ্ছিলেন, দ্যাখ তো কামাল, চোখে একটা কি পড়েছে। খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। ওর কাছে এসে চোখের নিচের চামড়াটা টেনে ধরেন এবং কালো পুতুলি-সহ গোলকটা ঘোরাতে থাকেন। কামাল বাঁ-হাতটা তাঁর কাধে ভর দিয়ে ডান হাতের আঙুলে ভুরুটা ধরে রেখে পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে চোখের ভিতরটা দেখতে থাকে। হয়তো অসর্তকতার ফলে উনি আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালেন, উরু জোড়া সামনাসামনি ওর শরীরকে স্পর্শ করেছে। (*শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন,*পৃ. ১১০)

আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাসের ঘটনাংশ যেহেতু চরিত্রপ্রধান, সেহেতু উপন্যাসের উপমা-অলংকারও চরিত্রকেন্দ্রিক। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য:

১. বিলকিস নিঃসঙ্গ, পাতা শুকিয়ে যাওয়া ঐ ঝাউগাছটার মতোই একা। (শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন, পৃ. ৮০)

২. লোকটা ছিল অতৃপ্ত অসহায় বোবা পশুর মতো, যৎসামান্য আদর দিলেও পায়ের কাছে গোলাম হয়ে থাকত। (শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন, পৃ. ৮৪)

৩. একসময় সচেতন হলে বিলকিস বুঝতে পারেন, তার মগজের ভিতরটা উনুনে ভাতের পাতিলের মতো টগবগ করে ফুটছে। (শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন, পৃ. ১২৮)

৪. দাঁড়িয়ে আছেন পাথরের মূর্তির মতো, আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে সিঁড়িতে পা দেন। (শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন, পৃ. ১৩৭)

৫. জগৎ ডোবা ঘুমে ঘুমিয়ে মুখটা ভরা ভরা, বালিশে ছড়ানো চুলের মধ্যে পরিপূর্ণ গোলাপের মতো। (শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন, পৃ. ১৩৮)

বলা বাঞ্ছনীয়, 'আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর এ- উপন্যাসে প্রথাগত ফর্মের মধ্যেই নব-আঙ্গিকের নিরীক্ষা করেছেন। বিশেষ করে, চরিত্রচেতনা-অনুষঙ্গী ইম্প্রেশন ও সংলাপ সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতা সন্দেহাতীত।'[১] *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন* উপন্যাসের শিল্প সার্থকতা প্রসঙ্গে সমালোচকমহল দ্বিধাদ্বন্দ্ববিদ্ধ। একজন সমালোচকের মতে-

> 'উপন্যাসে জীবন-পরিচর্যা যথোপযুক্ত নয়। কাহিনীর গভীরতা আছে, প্রসারতা নেই। চরিত্রগুলো মনস্তাত্ত্বিক আবর্ত থেকে মুক্ত হয় নি। উপন্যাস হিসেবে এটা ত্রুটি-মুক্ত নয়।'[১]

[১] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, প্রাগুক্ত পৃ. ২২২

তবুও বলা যায়, প্রকরণবৈচিত্র্য ও আঙ্গিক সচেতনতার স্বাক্ষর বিধৃত হয়েছে এ উপন্যাসে, বিভাগ-পরবর্তীকালে মধ্যবিত্তশ্রেণির দাম্পত্যজীবন ও জীবনের জটিলতা উপন্যাসটিতে অভিনব রীতিতে ব্যক্ত করেছেন ঔপন্যাসিক।

কর্ণফুলী

আলাউদ্দিন আল আজাদের *কর্ণফুলী*[২] বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ও আলোচিত আঞ্চলিক উপন্যাস। এটি *পদক্ষেপ* নামক পত্রিকার ঈদসংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে। পুস্তাকাকারে প্রথম প্রকাশ করেন কারাভাঁ প্রকাশনী, ঢাকা (১৯৬২)। *কর্ণফুলী* বাংলাভাষায় রচিত একমাত্র উপন্যাস যা ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেছে (১৯৬৩)। *কর্ণফুলী* উপন্যাসটিতে কর্ণফুলী নদীতীরবর্তী অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবিকা, জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, আবেগ-অনুভব, প্রকৃতির রূপ ও রূপান্তর উদ্‌ঘাটন করেছেন ঔপন্যাসিক। 'কর্ণফুলী উপন্যাসে আছে দু'অঞ্চলের মানুষের কথা – সমতল ভূমির বাঙালি আর পার্বত্য অঞ্চলের চাকমা ও অন্যান্য পাহাড়ি উপজাতির মানুষরা।'[৩]

নদীমাতৃক বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ নদীর মধ্যে কর্ণফুলী অন্যতম। কর্ণফুলী নদী চট্টগ্রাম ও রাঙামাটির প্রধান নদী। 'চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই নদীটি ভারতের মিজোরাম রাজ্যের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপত্তি হয়ে ১৮০ কি. মি. পার্বত্য পথ অতিক্রম করে রাঙ্গামাটিতে একটি দীর্ঘ ও সংকীর্ণ শাখা বিস্তার করে পরবর্তীতে আঁকাবাঁকা গতিপথে ধুলিয়াছড়ি ও কাপ্তাইয়ে অপর দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়েছে। নদীটি চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বরকল, গোবামুরা, চিলারডাক, সীতাপাহাড় ও পটিয়ার বেশ কয়েকটি পর্বতমালা অতিক্রম করে অবশেষে পতিত হয়েছে বঙ্গোপসাগরে।'[৪]

---

[১]মনসুর মুসা, *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, জুলাই ২০০৮, অ্যাডর্ণ পাবলিকেশন, ঢাকা, পৃ. ৯১

[২]আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'কর্ণফুলী' *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ২০০১, গতিধারা, ঢাকা। বর্তমান গ্রন্থে 'কর্ণফুলী' উপন্যাসের পাঠ এ সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে।

[৩]মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, 'আলাউদ্দিন আল আজাদ ও তার উপন্যাস', *আলাউদ্দিন আল আজাদ : জীবন ওসাহিত্য* (সিকদার আবুল বাশার সম্পা.), ২০০৩, বাতায়ন প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৫২

[৪]সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড-২, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ১৬৬-১৬৭

কর্ণফুলী নদীর নামকরণের পিছনে একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে।'একটি লোক-প্রচলিত আখ্যানকে কেন্দ্র করেই যে কর্ণফুলী নদীর নামকরণ হয়েছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আলাউদ্দিন আল আজাদ *কর্ণফুলী* নামে এ উপন্যাসটি প্রকাশ করায় মনে হয়, এ উপন্যাসে কর্ণফুলী নদীতীরবর্তী মানুষের বিচিত্র জীবনযাপন প্রণালীকে কল্লোলিনী কর্ণফুলীর জলপ্রবাহের সঙ্গে সমন্বিত করে পরিবেশন করেছেন তিনি। কিন্তু সমগ্র উপন্যাসে সে প্রত্যাশা দুঃখজনকভাবে দুর্লভ।'[১]

কর্ণফুলী উপন্যাসের ঘটনাংশ উপস্থাপিত হয়েছে প্রধানত পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের জীবনকথাকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসের প্রারম্ভে দেখা যায় কামারশালার শ্রমজীবী মানুষ হাতিয়ার তৈরিতে ব্যস্ত। আর সেখানেই দেখা হয় রমযানের সঙ্গে ইসমাইলের। ছিনতাইকারী, স্বাপ্নিক ও সাহসী যুবক ইসমাইল কর্ণফুলী উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের মূল নিয়ন্তা। কর্ণফুলী নদী তীরবর্তী চট্টগ্রাম শহরেই তার বসবাস। মা মানুবিবিকে নিয়েই তার সংসার। পেশায় সে একজন পকেটমার। দারিদ্র্যের কারণে পকেটমার ও অবৈধ কাজকে বেছে নিয়েছে সে। ইসমাইলের স্বপ্ন ছিল খুব বড় সারেং হবার। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর আর্থিক দুদর্শা। একটি দৃষ্টান্ত:

> স্বপ্ন ছিল সারেং হবে, খুব বড় সারেং, সাতদরিয়া যে চরে বেড়ায় সেই বড় জাহাজের সারেং, অনেক বড় স্বপ্ন, ছোটবেলার স্বপ্ন, কৈশোরের স্বপ্ন এবং যৌবনের স্বপ্ন। কিন্তু কোথায়? বুকের ঘাম, চোখের পানি এক করেও এত বছরে, একটা নলিও জোগাড় করতে পারে নি। (কর্ণফুলী, পৃ. ১৪৭)

দরিদ্র পরিবারের সন্তান ইসমাইল বেঁচে থাকার তাগিদে সম্পৃক্ত হয় রমযানের অবৈধ ও অনৈতিক পেশায়। অস্তিত্বের সংগ্রামে লড়াই করার জন্য পাহাড়তলীর বস্তি এলাকা ছেড়ে কিছুদিনের জন্য সে অবস্থান নেয় কাসালং নদীর অন্তঃপাতী পার্বত্যাঞ্চল ফুলছড়িতে। ইসমাইলের অবস্থান থেকে ফুলছড়ির নিসর্গবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ঔপন্যাসিক যা চিত্রিত করেছেন তা নিম্নরূপ:

> রাত্রির পটে আঁকা অস্পষ্ট গ্রামখানা, রহস্যময় স্বপ্নের মতো। এখানে যাত্রার শেষ। চাটগাঁ থেকে চন্দ্রঘোনা হয়ে রাঙামাটি পঁয়ষট্টি মাইল, এবং তার পরেও চৌদ্দ। দূর কম নয়। (কর্ণফুলী, পৃ. ১৫৮)

[১]গিয়াস শামীম, *বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস*, প্রথম প্রকাশ ২০০২, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ২৬

বিভ্রান্ত যুবক ইসমাইল হঠাৎ পাহাড়তলীর বস্তির জীবন ছেড়ে বেছে নেয় গহীন পার্বত্যাঞ্চল। অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে ধূর্ত ব্যবসায়ী রমযান ইসমাইলকে নিয়ে আসে দুর্গম পার্বত্যাঞ্চলে। এই অঞ্চলে এসেই 'প্রথমে পরিচিত হয় এক অদ্ভুত-দর্শন ব্যক্তির সঙ্গে। তার নাম লালন–লালচাচা; পাগলাজামাই। এ এলাকায় লালন ছিলো একজন আগন্তুক। একদা বাঁশ কাটতে এসে চাকমা মেয়ে ধলাবিকে বিবাহ করে সে এখানেই এখন স্থায়ীভাবে বসবাস করছে।'[১] ফুলছড়ির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয় সে। শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সে মগ্ন থাকেনি, লালনচাচার মেয়ে রাঙামিল্যার প্রতি প্রথম দর্শনে সে হয়ে ওঠে বিমোহিত ও উল্লসিত। 'তার অন্তর্সত্তায় সে অনুভব করে লিবিডোর দুর্বার টান।'[২] কিন্তু রাঙামিল্যা ভালোবাসে চাকমা ছেলে নীলমণিকে। নীলমণি এবং রাঙামিল্যার প্রেম সম্পর্কে ধলাবি ও লালনচাচাও অবগত। কিন্তু নীলমণি দেওয়ান বংশের ছেলে। তাই নীলমণির সঙ্গে রাঙামিল্যার বিবাহ হবে কিনা–তা নিয়ে চিন্তিত ধলাবি ও লালনচাচা। এদিকে রাঙামিল্যার দিকে কুদৃষ্টি দেয় রমযান। বিবাহযোগ্য মেয়ে রাঙামিল্যার অবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন হয় ধলাবি-লালনচাচা। সুযোগসন্ধানী রমযান সম্পর্ক গড়ে তোলে লালনচাচার সঙ্গে। একসময় রমযানের অসদুদ্দেশ্য বুঝতে পারে লালনচাচা। অন্যদিকে ইসমাইল রাঙামিল্যার প্রেমে পড়ে তাকে উপহার দেয় শাড়ি। কিন্তু ধলাবি-লালনচাচার ইচ্ছা নীলমণির সঙ্গে রাঙামিল্যার বিয়ে হোক। 'যেহেতু চাকমা সমাজে লালন-ধলাবি সামাজিকভাবে পরিত্যাজ্য সেহেতু নীলমণির সঙ্গে রাঙামিল্যার বিবাহ অসম্ভব। অর্থনৈতিক মানদণ্ডে নীলমণির পিতা কেনারাম দেওয়ান সচ্ছল; পক্ষান্তরে লালন-পরিবার অভাবগ্রস্ত। এমতাবস্থায় রাঙামিল্যা ও নীলমণি বিবাহের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়।'[৩]

সে অনুযায়ী রাঙামিল্যা রাতের অন্ধকারে নীলমণির সঙ্গে পালিয়ে যায়। অন্যদিকে এ সময় রাঙামিল্যাকে অনুসরণ করতে থাকে 'প্রেম-প্রতিজ্ঞায় উজ্জীবিত, প্রতিহিংসায় উন্মত্ত, উত্তেজনায় কম্পমান, বিভ্রান্ত-যুবক ইসমাইল। ওদিকে ইসমাইলকে অনুসরণ করে রমযান আলীর ভাড়াটে গুণ্ডা হাপু আর ইতু। হাপু-ইতু-নীলমণিকে পরাস্ত করে ইসমাইল অবশেষে

[১]গিয়াস শামীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

[২]গিয়াস শামীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

[৩]গিয়াস শামীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

অর্জন করে তার ইপ্সিত সম্পদ।'[১] হঠাৎ জ্যোৎস্নার মায়াবিভ্রমে বদলে যায় ইসমাইলের মন। তার মন থেকে ভেসে যায় প্রতিহিংসা ও দ্বন্দ্ব। রাঙামিল্যা এবং নীলমণিকে কাপ্তাই-এ পৌঁছে দিয়ে সে চলে আসে চট্টগ্রাম শহরে।

কয়েকদিন অবসন্ন চিত্তে সময় কাটাবার পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করে ইসমাইল। বাড়ি ফিরেই মা মানুবিবির কাছে সে শুনতে পায় কেরামতের মেয়ে জুলির বিয়ে প্রসঙ্গ। কিন্তু এই সংবাদে খুশি হতে পারে না ইসমাইল। পেশাদার ঘটক গণু মুন্সি জুলির বিয়ে ঠিক করেছিল সম্পদশীল বয়স্ক এক ব্যক্তির সঙ্গে। কিন্তু জুলি ভালোবাসে ইসমাইলকে। এমতাবস্থায় ইসমাইল জুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য যখন অস্থির, তখন রাতের আঁধারে জুলি উপস্থিত হয় ইসমাইলের কুটিরে।

জ্যোৎস্নার বিভ্রমে পর্বত দুহিতা রাঙামিল্যাকে কাছে পেয়েও যে ইসমাইল আত্মসংবরণ করেছে সে-ই অবশেষে রাতের গভীরে জুলিকে পেয়ে মনের তীব্র বাসনা মিটিয়ে নেয়। একটি দৃষ্টান্ত:

> দেখতে পাওয়া মাত্র জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে ছিটকে এল ইসমাইল, শক্তিশালী চুম্বকের ধারে কাঁচা লোহার মতো। হাত ধরে এক ঝট্‌কায় টেনে নিল। এরপর চৌকির ধারে গিয়ে ফুঁ দিয়ে কুপিটা নিভিয়ে ফেলে। (কর্ণফুলী, পৃ. ১৯৪)

অতঃপর ইসমাইল বিয়ে করে জুলিকে। সঙ্গত কারণেই তাদের দাম্পত্যজীবনে নেমে আসে অর্থনৈতিক সংকট, হতাশা, বিষাদ। ইসমাইলের অন্তর্জগতে যুগপৎ কাজ করে দ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তি। আবার দারিদ্র্যের সংকট থেকে উত্তরণের চেষ্টা করেও সে বিফল হয়। অতঃপর সিদ্ধান্ত নেয় 'দূর সমুদ্রে পাড়ি '[২] জমানোর।

ইসমাইলের এ দুর্দিনে সহযোগিতার জন্য জুলি তার অলংকার বিক্রি করবার সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও জুলি ও মানুবিবি মন থেকে চায় না ইসমাইল দূরে চলে যাক। ইসমাইলকে সারেং বৃত্তি থেকে বিমুখ করায় তারা শরণাপন্ন হয় কানু ফকির প্রদত্ত তাগা-তাবিজের। কিন্তু তাদের সমস্ত চেষ্টা বিফল হয়।

---

[১]গিয়াস শামীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

[২]মনসুর মুসা, *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, জুলাই ২০০৮, অ্যাডর্ণ পাবলিকেশন, ঢাকা, পৃ. ৯০

উপন্যাসের অন্তিমে দেখা যায়, সহধর্মিনী জুলির অনুনয় ও মা মানুবিবির কান্নাকে উপেক্ষা করে ইসমাইল সারেং হবার জন্য অজানা গন্তব্যে পাড়ি দেয়। শেষ পর্যন্ত অশ্রুসিক্ত নয়নে মা মানুবিবি ও স্ত্রী জুলি বিদায় জানায়। এতৎপ্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের ভাষ্য:

> জুলি কাঁপছে, জাহাজের সিঁড়ি থেকে জেটির গোড়ায় নেমে কাঁপছে। কাঁপছে ওর চোখমুখ, ঠোঁটজোড়া। একটু পরেই সবশেষ। সকলে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। বিদায়ের ক্ষণ। ও কি করবে! এখন লজ্জা পাওয়া নির্বুদ্ধিতা, ভাবল কি ভাবল না, ওর বুক সাপটে ধরে নিজের মুখটা ঘষে এবং পরক্ষণেই রোদন-ভরা স্বরে কাতরে উঠল, শরীরের যত্ন নিও! (কর্ণফুলী, পৃ. ২০৮)

কর্ণফুলী উপন্যাসখানি পাঠ করলে দেখা যাবে, প্রথাগত রীতিকেই বেছে নিয়েছেন ঔপন্যাসিক। কর্ণফুলী নদী তীরবর্তী অঞ্চলের পরিবেশের সঙ্গে চরিত্রের সমগ্র জীবনচিত্র ফুটে উঠেনি, বরং ঘটনার সূত্রে আঞ্চলিক কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন অসাধারণভাবে।

উপন্যাসের প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্র খণ্ডিত। মূল কাহিনির সঙ্গে সম্পর্কহীন ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে এতে। কোন চরিত্রই পরিপূর্ণতায় উদ্ভাসিত হয়নি।

উপন্যাসে উপস্থাপিত চরিত্রসমূহের মুখে কখনও কখনও উচ্চারিত হয়েছে লোকভাষা ও আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গি। চট্টগ্রামের উপভাষা প্রয়োগেও লেখক ত্রুটিমুক্ত নন। বলা বাহুল্য, কর্ণফুলী নদীর সঙ্গে উপন্যাসের চরিত্রসমূহের সম্পৃক্ততা খুবই কম। উপন্যাসে চিত্রিত পাহাড়িদের জীবন ও জীবিকা, সংস্কৃতি প্রভৃতি জানার জন্যেই লেখক পাবর্ত্য চট্টগ্রাম যেতেন। এ প্রসঙ্গে আলাউদ্দিন আল আজাদ বলেছেন, 'উপন্যাস লেখার উপকরণ সংগ্রহ করতেই আমি পার্বত্য চট্টগ্রামে মাঝে মাঝে যেতাম।'[১] এতৎপ্রসঙ্গে আলাউদ্দিন আল আজাদের *কর্ণফুলী* উপন্যাস সম্পর্কিত আরেকটি বক্তব্য নিম্নরূপ:

> চরিত্রকে 'স্বাভাবিক' করার চেষ্টায় আমি এ- বইয়ে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করিনি। চিত্র যেমন বিভিন্ন রং দিয়ে একটি সৃষ্টি সম্পন্ন করেন, তেমনিভাবে আমি বিভিন্ন ভাষার রং ব্যবহার করেছিমাত্র; কর্ণফুলীর জীবনধারা, সবুজ প্রকৃতি, শ্যামল পাহাড় ও সাগর সঙ্গমে বয়ে চলা প্রবাহের মতোই এই ভাষা অবিভাজ্য। শিল্পসিদ্ধির জন্য এর অবলম্বন আমার কাছে অপরিহার্যরূপে গণ্য হয়েছে।[২]

---

[১]আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'ভূমিকাংশ' *কর্ণফুলী*, (৫ম স.), ঢাকা, ১৯৯৬

[২]আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'ভূমিকাংশ' *কর্ণফুলী*, (৫ম স.), ঢাকা, ১৯৯৬

উপন্যাসে 'ইসমাইল কিছুটা ব্যতিক্রমী হলেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত নয়। রমযান আলী, জুলি,লালন, ধলাবি, নীলমণি, রাঙামিল্যা প্রভৃতি চরিত্র গতানুগতিক। ঘটনাবয়নে যেমন, ঠিক তেমনি চরিত্র নির্মাণেও লেখক আতিশয্যমুক্ত ছিলেন না।[১]

উপন্যাসে মানুবিবি ও জুলির ভূমিকা ছিল সক্রিয়। ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণে *কর্ণফুলী* উপন্যাসটি উপস্থাপিত। এতে কাহিনি বিন্যাসে সুশৃঙ্খল ধারাবাহিকতা নেই। কাহিনিবর্ণনে ঔপন্যাসিক অনেক সময় চরিত্রের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন। আঞ্চলিক পট-পরিবেশের সঙ্গে চরিত্রসমূহ বিকশিত নয়। ঘটনার প্রয়োজনে কিছু চরিত্রে আঞ্চলিক ভাব ও ভাষা ব্যবহার করেছেন তিনি। ঔপন্যাসিক চরিত্রসমূহের কথোপকথন বিন্যাসে পার্বত্য রাঙ্গামাটি ও চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। ইসমাইল ও রমযানের কথোপকথন প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গির দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়:

> ইসমাইল হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, কিছু টেঁয়া দও। বাড়িৎ দেওন পড়িব। ... রমযান, শুধাল, ন যাবি? (*কর্ণফুলী*, পৃ. ১৪৮)

আরও কিছু দৃষ্টান্ত:

মানুবিবি ও ইসমাইলের কথোপকথন লক্ষণীয়:

> মানুবিবি, বলল, তোরে ঠেকাই আর কি অইবো, তুই তো শুনতি না। যাতি চাস, যা। আঁই তো আর দুনিয়াৎ বেশিদিন নাই; কইদ্দে তুই একটা বিয়াশাদি ন করিবি? কেরামতের মাইয়া ইবা তো ভালা, আঁর খুব পছন্দ- রাখ। ইসমাইল তিরিক্কিস্বরে বলল, ইত্তরি বিঁয়াশাদি কত্তাম না। (*কর্ণফুলী*, পৃ. ১৫৩)

রাঙামিল্যা ও ধলাবির কথোপকথনে ব্যবহৃত হয়েছে আদিবাসী চাকমাদের ভাষা:

> রাঙামিল্যা বলল, মুই এক্না ক্যাভত্ বাত্তি দ্যা যেম! ধলাবি খানিকটা অবাক হয় যেন। তাই কারণ জিগ্গেস করল, আ হিত্তেই বাত্তি? (*কর্ণফুলী*, পৃ. ১৮৫)

নীলমণি ও রাঙামিল্যার কথোপকথনে আঞ্চলিক ভাষার প্রকাশ দৃশ্যমান:

> ... নীলমণির উৎসাহের অন্ত নেই। সে বলতে থাকে, সিদু ইক্য ইঞ্জিনিয়ার আগে। নাং প্রিয়রঞ্জন চাংমা। তারে হোনেই এক্না হাম লংয়ং, হালখানার কাম। ইক্কু মাজে আশি টেঙা পা জেব। পরে বাড়ী পারে। আশি টেঙা লই আমা দিজনর ন অব? একনা চিকর ঘর পেবং-স্যান ভাড়া না লাগিব্য? হি? হিদুক্যা অব? (*কর্ণফুলী*, পৃ. ১৮৮)

[১]গিয়াস শামীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

কর্ণফুলী উপন্যাসটি প্রধানত ইসমাইলের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে বিন্যস্ত। ইসমাইলের অনৈতিক জীবনযাপন,তাঁর স্বপ্ন, প্রেম, সংগ্রামমুখর জীবন, বিবাহ প্রভৃতি চিত্রায়িত হয়েছে এ উপন্যাসে। জুলিকে বিয়ের পরবর্তী সময়-পরিসর উপন্যাসে বিন্যস্ত হয়েছে গীতাত্মক অনুষঙ্গে। ইসমাইলের অন্তর্জগতে দৃশ্যায়িত বর্ণনানুষঙ্গ লক্ষণীয়:

> ... দুনিয়াটা কত বড়। একদিন বাসে চড়ে সমুদ্রতীরে গিয়ে বুঝতে পারল। থৈ থৈ করছে পানি। জাহাজের চোঙ দেখা যাচ্ছে। ফেনিল ঢেউ এসে আছড়ে আছড়ে পড়ছে বালুকা বেলায়। কুলকিনারাহীন দরিয়া। কুশিতে সে খালি পায়ে নরম বালির ওপর দিয়ে দৌড়ে যায়। (*কর্ণফুলী, পৃ.* ১৯৬)

বিষয় বর্ণনায় ও চরিত্র চিত্রণে *কর্ণফুলী* উপন্যাসে বেশ কিছু উপমা অলংকার ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক। কিছু দৃষ্টান্ত:

ক. মাথাটা কদম ফুলের মতো, ছোটো ছোটো করে ছাঁটা চুল। (*কর্ণফুলী*, পৃ. ১৪৫)

খ. দরিয়ার ভাঙা জাহাজের মতো টুকরো টুকরো হয়ে চিরতরে ডুবে যাওয়াই ভাল। (*কর্ণফুলী*, পৃ. ১৪৭)

গ. সে যেন আরেক দুনিয়া, কিসসার মুলুকের মতো। (*কর্ণফুলী*, পৃ. ১৫৫)

ঘ. খল্‌খল্ করে হেসে উঠে ভালুকের মতো লোকটা বেরিয়ে গেল। (*কর্ণফুলী*, পৃ. ১৬১)

ঙ. ঘরের কোণে গাছের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়েছিল একজন, ভূতের ছায়ার মতো, সে ইসমাইল, একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। (*কর্ণফুলী*, পৃ. ১৬৮)

চ. সে যেন ফণা উঁচিয়ে ওঠা সাপের মতো মারমুখী । (*কর্ণফুলী*, পৃ. ১৭২)

ছ. মনে পড়ে, ওর বাপটাও জোয়ানকালে এমনি ছিল, বাঘের মতো জোরদার, বেপরোয়া। (*কর্ণফুলী*, পৃ. ১৯৪)

কর্ণফুলী উপন্যাসে শ্রমজীবী মানুষ তথা পকেটমার, চোরাকারবারি, কামার, সারেং, ঘটক, শ্রমিক, ফেরিওয়ালার পাশাপাশি দরগাহ্ ফকিরের চরিত্রও লক্ষণীয়। ফকিরের তাবিজ-কবজ প্রসঙ্গও বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসে। একটি দৃষ্টান্ত:

> কি জবরদস্ত আদমি! আর কি গলার আওয়াজ! জুলির দিল-কলজে নড়ে ওঠে। সে গাঁট থেকে খুলে একটাকা সাড়ে পাঁচ আনার পয়সা তাঁর পায়ের কাছে রাখল। মানুবিবিকে চিনতে পারে ফকির। এরপর জুলির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আগুনের মতো ধক্‌ধক্ চোখ, পুড়িয়ে ফেলবে নাকি? না, এই তো পাতা দু'টো বন্ধ করল! আবার ফকির চিৎকার করে ওঠে, হইয়ে । হইয়ে! তুই যা চাস, পাবি। (*কর্ণফুলী*, পৃ. ২০৫)

এ উপন্যাসে ব্যবহৃত কিছু শব্দ চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জনজীবনেরই পরিচয়বহ। যেমন: ইক্কানি, ইত্তারই, কাম, টেঁয়া, ইবা কন, হুনি, সালুন, পুত, পুয়া, আঁই, মুই, পুরুত, সওয়াল, লাঙ্গ, আঁরে প্রভৃতি।

বলা বাঞ্ছনীয়, কর্ণফুলী উপন্যাসের বিষয় নির্বাচনে আলাউদ্দিন আল আজাদ বৈচিত্র্যময়তার স্বাক্ষর উৎকীর্ণ করেছেন। বিশেষ একটি অঞ্চলকে উপস্থাপনের আকাঙ্ক্ষা থেকে উপন্যাসের ঘটনাংশ গৃহীত হলেও শেষাবধি এতে বিষয় ও চরিত্রের সাযুজ্য রক্ষিত হয়নি। অবশ্য একটি বিশেষ অঞ্চলের জীবনধারা অর্থাৎ local color and habitations রূপায়ণে লেখক যে পারদর্শিতা প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছেন এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

ক্ষুধা ও আশা

ক্ষুধা ও আশা[১] (১৯৬৪) আলাউদ্দিন আল আজাদের রাজনৈতিক চেতনাত্মক উপন্যাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর ও ভারত বিভাগের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত অবলম্বনে রচিত হয়েছে এ উপন্যাস। গ্রামীণ ও শহুরে জীবনধারার খণ্ড খণ্ড বাস্তবতার চিত্র উপন্যাসটিকে অনেক বেশি জীবনঘনিষ্ঠ করেছে। সাত পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এ এপিক উপন্যাসে দুর্ভিক্ষপীড়িত উদ্বাস্তু মানুষের জীবনসংগ্রামের পাশাপাশি শহরের মধ্যবিত্ত-উচ্চমধ্যবিত্তের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনাও রূপায়িত করেছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণে রচিত দীর্ঘ পরিসরের এই উপন্যাসটিতে দুর্ভিক্ষের অভিঘাতে ব্যক্তিমানুষের অন্তর্যন্ত্রণা, অস্তিত্বসংগ্রাম, অপমৃত্যুর সমান্তরালে উদ্বাস্তু সমস্যা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রভৃতি উপস্থাপিত হয়েছে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একক কাহিনির বৃত্তে আবদ্ধ থাকতে পারেননি ঔপন্যাসিক।

ক্ষুধা ও আশার বিষয়ভাব আলোচনা প্রসঙ্গে আলাউদ্দিন আল আজাদ বলেছেন:

[১]আলাউদ্দিন আল আজাদ, *ক্ষুধা ও আশা*, শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ২০০১, গতিধারা, ঢাকা। বর্তমান গ্রন্থে ক্ষুধা ও আশা উপন্যাসের পাঠ এ সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে।

> আমরা যুদ্ধ দেখেছি। দেখেছি ধ্বংস, সকল নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অপমৃত্যু দুর্ভিক্ষ। তার পরেই তথাকথিত স্বাধীনতা। আর চক্রান্তের রাজনীতির বহুরূপি চরিত্র; ফলে আশাভঙ্গ, হতাশা, নৈরাশ্য। এমন প্রাচুর্যের দেশেও দুর্ভিক্ষে লাখে লাখে প্রাণ দিয়েছি কিন্তু পরাধীনতার কবল থেকে মুক্তি পেয়েও সেই দুর্ভিক্ষকে জয় করতে পারিনি।[১]

'*ক্ষুধা ও আশা* উপন্যাসটিতে চল্লিশের দশকের ঢাকা শহরে যে আকাল নেমে এসেছিল, তার বাস্তবনিষ্ঠ চিত্র উঠে এসেছে। রেললাইনের পাশ দিয়ে পলিথিনের ছাউনিতে যেসব ছিন্নমূল পরিবার বসবাস করতো, তাদের জীবনের বাস্তব ছবি অঙ্কন করেছেন ড. আজাদ 'ক্ষুধা ও আশা'য়। ড. আজাদই সর্বপ্রথম পূর্ববাংলার মানুষের লড়াকু জীবনের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন।'[২]

উপন্যাসের প্রারম্ভিক পর্যায়ে দেখা যায়, রতনপুর গ্রামে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিম্নবিত্ত শ্রেণির হানিফের পরিবার বিপর্যস্ত। অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে অনাহারক্লিষ্ট হানিফ পাড়ি জমিয়েছেন স্ত্রী ফাতেমা, ছেলে জোহা ও মেয়ে জুহুকে নিয়ে নিরুদ্দেশের উদ্দেশে। ইতোমধ্যে দুর্ভিক্ষের ছোবলে মারা যায় ফাতেমার তিন সন্তান; দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তাই তারা বেরিয়ে পড়ে জীবনরক্ষার প্রেরণায়। একসময় অগণন মানুষের কাতারে তারাও শামিল হয়ে যায়:

> অদ্ভুত অবস্থা, ভোরের আলো ফোটার আগে শেষরাতের অন্ধকারে বেরুবার সময় ছিল এক পরিবার কিন্তু সূর্য ওঠার পর কয়গ্রাম পিছনে ফেলে জমিনের পথ থেকে বটতলায়, এসে থামলে, রীতিমত এক জনতা।' (*ক্ষুধা ও আশা, পৃ.* ২২৭)

জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে হানিফ একসময় নিজের মেয়েকে অনৈতিক উপায়ে বিক্রিও করে দিতে চায়–

> রাইতে একজন দালাল আইয়ে– ... মেয়েলোক কিনার দালাল! ... জিনিস বুইঝা দাম। দশ পনের বিশ তিরিশ শ তিন পাঁচশ পর্যন্ত। জহুরে বেচবা? ... আমরার কাছে থাকলে তো মরব। বেচলে বালা থাকব, আর আমরাও দু'পয়সা পাইয়াম। মরলে তো শেষ। মরণের থ্যে এইড্যা মন্দ কি, ভাইব্যা দেহ। (*ক্ষুধা ও আশা, পৃ.* ২৪২)

---

[১] উদ্ধৃত, আহমেদ মাওলা, *বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে প্রবণতাসমূহ*, বাংলা একাডেমি, জুন, ১৯৯৭, ঢাকা, পৃ. ১৯

[২] মাহমুদুল বাশার, *বাংলাদেশের কথাসাহিত্য*, পারিজাত প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০১২, ঢাকা, পৃ. ২১০

হানিফ এক পর্যায়ে ক্ষুধামুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সপরিবারে উপস্থিত হয় ঢাকা শহরে। অচেনা শহরে বাঁচার তাগিদে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় তাকে। শাহরিক পরিবেশে তাদের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে নিম্নোক্ত বর্ণনাংশে:

> মাথায় কাপড় টেনে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে ফাতেমা, এবং তার গা ঘেঁষে জহু; জোহা ফিরতেই দেখে, লোকজন যেভাবে ওদের দিকে চেয়ে আছে, যেন তারা এক দেখবার জিনিস; সার্কসের জীব। কিন্তু আসলে তাদের মনোযোগ গেঁয়ো চাষা হানিফের দিকে। (*ক্ষুধা ও আশা*, *পৃ*. ২৪৭)

অতঃপর এ অচেনা শহরে এসে তারা নবতর জীবন সংগ্রামের মুখোমুখি হয়। শহরের বিচিত্র দৃশ্য ও ঘটনা দেখে হতভম্ব হয়ে যায় তারা। অচেনা শহরের দৃশ্যপট সম্পর্কে উপন্যাসে জোহার অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে এভাবে:

> একটি নতুন সকাল। গাছপালা মাটির গন্ধ মেশানো গ্রামের নয়, শহরের একটি দিন। শহরের কথা শুনেছে বহুবার, শহরের চকমকে জিনিস দেখেছে বাজারে বন্দরে গিয়ে, শহর থেকে কেউ এলে তার কাছে ভীড়ও জমিয়েছে; কিন্তু প্রকৃত শহর বস্তুটা যে এরকম, বুঝতে পারেনি। ... বুঝতে পারে এখানে বাঁচতে হলে লাগবে কঠিন পণ এবং কেঁচোর মতো জীবনীশক্তি। (*ক্ষুধা ও আশা*, *পৃ*. ২৫৬)

হানিফ পরিবারের অসহায় ও উন্মুলিত বাস্তবতার চিত্র উপন্যাসে মূলত উঠে এসেছে জোহা চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে। এ পরিবারের জীবনসংকটের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত হয়েছে ব্যাপক মানুষের জীবনসংগ্রামের ভয়াবহ চিত্র। 'কলোনিশাসিত সমাজের আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার জটিল বিকার জোহা পরিবারের মতো অনেককেই ছিন্নমূল ও উদ্বাস্তু করে দেয়। শহরের অচেনা পরিবেশে (outsider) অস্তিত্বের ন্যূনতম দাবি মেটাতে একমাত্র জোহা ছাড়া বাকি তিনজনই নিমজ্জিত হয় মৃত্যু অথবা বিনষ্টির অন্ধকারে। বিনষ্ট সমাজ, বিনষ্ট আর্থ-রাজনীতি এবং বিনষ্ট মানুষের নিয়ন্ত্রণে বিপর্যস্ত জীবনের গোটা ছবিই উপন্যাসে বিন্যস্ত হয়েছে। জোহার বহির্সংগ্রাম ও অন্তর্সংগ্রামের মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছে একটা সময়-খণ্ডের অসংখ্য মানুষের জীবনরূপ।'[১] ধীরে ধীরে এ পরিবারের সমস্ত স্বপ্নসাধ উবে যেতে থাকে। অমানবিক পরিস্থিতির চাপে পিষ্ট ও চূর্ণ হতে থাকে তারা। খাদ্যের অন্বেষণ করতে গিয়ে সম্ভ্রম হারাতে হয় জহুকে। মিলিটারির কন্ট্রাক্টর বাদশা কর্তৃক ধর্ষিত হয় জহু। শুধু বলাৎকারের ঘটনাই নয়, একসময় অন্ধকার জগতে নিক্ষিপ্ত হয় জহু। কন্ট্রাক্টর বাদশার ইচ্ছানুযায়ী তার ঠিকানা হয় নিষিদ্ধ গণিকালয়। '*ক্ষুধা ও আশা* উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত জহুরা রক্ষা পায় নি, বনিতার জীবন, গলগ্রহের জীবনকেই বেছে নিতে হয়েছে। পদে পদে

[১]রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

মাংসাসী দানবের উপদ্রব, আর ক্ষুধার তাড়নায় নিষ্পেষিত জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য যৌবন রক্ষা করা দায়। মূল্যবোধহীন শোষক সমাজে সতীত্ব সুখ আর স্বপ্ন খুব তাড়াতাড়ি বিক্রি হয়ে যায় কানাকড়ির দামে।'[১]

ক্ষুধা ও আশা উপন্যাসে প্রথম থেকে চতুর্থ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ঔপন্যাসিক একটা দুর্ভিক্ষপীড়িত জীবনবাস্তবতা, মৃত্যু, নির্যাতন-নিপীড়ন প্রভৃতি ঘটনা প্রকাশ করলেও 'পঞ্চম পরিচ্ছেদের পর উপন্যাসের মধ্যবিত্ত কিছু চরিত্রের সূত্র ধরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, স্বদেশী আন্দোলন, পাকিস্তান প্রশ্ন, অখণ্ড বাংলার সংকট, সুভাষ বসু কিংবা মহাত্মা গান্ধীর রাজনীতি পক্ষ-বিপক্ষ আলোচনা প্রাধান্য পায়।'[২]

ক্ষুধা ও আশা উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র জোহা গার্হস্থ্য জীবন ছেড়ে শহরে কর্মের সন্ধানসূত্রে রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলেছে,

> ভিক্ষা চাই না আমি, কাজ চাই! *(ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ২৫০)

একসময় জোহা কাজ পায় এবং সাময়িকভাবে স্থান পায় চৌধুরী পরিবারের গৃহভৃত্য হিসেবে। ঘটনাক্রমে মধ্যবিত্ত মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত আলী মতুর্জা চৌধুরীর কন্যা লীনা ও পুত্র রেজার সঙ্গে পরিচয় ঘটে জোহার। বামপন্থী রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ আলীর সমাজতান্ত্রিক জীবনাদর্শ তাকে প্রভাবিত করে। আলীর স্বপ্নাদর্শ ও চিন্তা-চেতনা তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক এভাবে:

> ... মূলত তিনতরঙ্গের তিনটি চাকায় সে জড়িয়ে আছে: যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ আর স্বাধীনতা আন্দোলন। (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ৩০৯)

'হানিফ পরিবারের কাহিনীকে আরো হৃদয়গ্রাহী করার জন্য লেখক শাখা কাহিনী হিসেবে এনেছেন চৌধুরী পরিবারকে। লেখক সম্ভবত একটানা ক্ষুধা-দারিদ্র, মৃত্যু, নিপীড়ন ইত্যাদির বর্ণনায় সস্তি পাচ্ছিলেন না, তাই চৌধুরীর কন্যা লীনা-সেলিনা এবং মোহাম্মদ আলীর প্রেমের উপাখ্যান যুক্ত করেন। অবশ্য এ পরিবারটির মাধ্যমে লেখক সমকালীন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক অবস্থান ও চিন্তা-চেতনাকে স্পর্শ করেছেন।'[৩]

---

[১] শহীদ ইকবাল, *বাংলাদেশের উপন্যাসে রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য*, অন্বেষা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০১০, ঢাকা, পৃ. ৭৭

[২] শহীদ ইকবাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

[৩] আহমেদ মাওলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

মোহাম্মদ আলী সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে বিশ্বাসী; গণমানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে একাগ্র। কিন্তু 'লিনা-সুজাতার দ্বৈত-প্রেমের টানাপোড়েনে এবং সুজাতাকে বৈবাহিক সম্পর্কে লাভ করতে ব্যর্থ হয়ে আত্মদ্বন্দ্বের একপর্যায়ে তার অনেকটা মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে।'[১]বামপন্থী রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ আলীকে ভুখ মিছিলে নেতৃত্ব দানের জন্যে কারাবাস করতে হয়। শেষাবধি রাজনীতিতেও ব্যর্থ হয় সে। রাজনীতি এবং প্রেমে ব্যর্থ হয়ে সে অবশেষে হয়ে পড়ে শূন্য-অস্তিত্ব।একপর্যায়ে সে সমর্পিত হয় 'নিষিদ্ধ পল্লীতে', কিন্তু মুক্তিপথের সন্ধান না পেয়ে হয়ে পড়ে হতাশ ও বিবর্ণ। মোহাম্মদ আলী পতিতা করবীর কাছে তার চিন্তা-চেতনা প্রকাশ করে এভাবে:

> নতুন দেশ নতুন সমাজ আমি গড়ে তুলবো, তোমরা হবে আমার অগ্নিসেনানী।(*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ৩৩২)

লীনার আত্মহত্যার পর কবরের কাছে স্বগতোক্তি ও অনুশোচনা করেছিল আলী। হৃদয়ের খেদোক্তি প্রকাশ করেছিল এভাবে:

> আমাকে ক্ষমা করো না তুমি, ক্ষমা করো না । আমি অধম, হতভাগ্য, তবু ক্ষমা করো না। যদিও, তোমাকে চাইনি সে আমার ভুল, তাকে চেয়েছিলাম সেও আমার ভুল, তবু ক্ষমা করো না । তোমার ধিক্কার নিয়েই আমি বাঁচবো, বেঁচে থাকতে চাই। আর এভাবেই তোমার মৃত্যুর শোধ হোক।
> (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ৩৫৬)

ক্ষুধা ও আশা উপন্যাসে আধুনিক জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিশ্বাসী চরিত্র অঘোর চ্যাটার্জি। অঘোর বাবু, সুজাতা, অরুণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বপ্ন ও চেতনাকে ধারণ করে। কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনায় অসাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি থেকে মুক্ত হতে পারেননি। যার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমান-হিন্দু সম্পর্ক কখনও এক হবার নয়। মেয়ে সুজাতার সঙ্গে মোহাম্মদ আলীর প্রেমের সম্পর্ক তিনি মেনে নিতে পারেননি। অঘোর বাবু আলীকে উদ্দেশ্য করে বলছিলেন তার ভাবনার কথা:

> তোমরা পাকিস্তান পাচ্ছ, তার মানে ভারত ভাগ হয়ে যাচ্ছে আর আমরা হচ্ছি চিরতরে বিচ্ছিন্ন। ... হোয়াট বেঙ্গল থিংক্স টু-ডে ইন্ডিয়া থিংক্স টুমোরো। মিথ্যে মিথ্যে। অহমিকা, আত্মগরিমা। এর মূল্য আমাদের দিতে হবে। কিন্তু ধ্বংস ও মৃত্যুর শেষে মুক্ত স্বাধীন ভারতে বাঙালী পঙ্গু হয়ে থাকবে

[১]মুহাম্মদ ইদরিস আলী, *আমাদের উপন্যাসে বিষয় চেতনা* : বিভাগোত্তর কাল, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৮, ঢাকা, পৃ. ১১৭

> এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না । আচ্ছা, তোমরা বাংলাকে, সমগ্র বাংলাকে পাকিস্তান বানাতে পারো না? (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ৩২৯)

দেশবিভাগ হবার আশঙ্কায় অঘোর বাবু সাংঘাতিকভাবে চিন্তিত ছিলেন। প্রতিহিংসার রাজনীতি কখনও দেশকে, দেশের মানুষকে ভালো থাকতে দেয় না; এই সত্য-উপলব্ধি তাঁর মধ্যে ছিল। যে কারণে আলী ও সুজাতার মহৎ প্রেম উপলব্ধি করা সত্ত্বেও ভবিষ্যতের কথা ভেবে আলীকে মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করতে নিষেধ করে দিয়েছেন অঘোর বাবু। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের আশঙ্কায় শেষ পর্যন্ত তিনি পাকিস্তান ত্যাগ করেছেন। ইতিহাসপাঠ ও আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি বাঙালির দুঃসময় ও অন্ধকার সম্পর্কে জ্ঞাত হন। 'আত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়ে অঘোর চ্যাটার্জি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক প্রসঙ্গে স্বীকার করেন যে, সুদূর অতীত থেকেই হিন্দুরা মুসলমানদেরকে মানুষ বলে মনে করেননি। তাই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য বলে তার মনে হয়েছে।'[১] অসাম্প্রদায়িক, উদারনীতিক ও ভবিষ্যদ্বক্তা অঘোর চ্যাটার্জি আত্মবিশ্লেষণ সূত্রে বলেছেন:

> তোমাদেরকে আমরা ঘৃণা করেছি, বলেছি জানোয়ার, পশু। তোমাদেরকে ম্লেচ্ছ নেড়ে আর যবন আখ্যায় ভূষিত করেছি। তোমরা আমাদেরকে নেবে কেন, নিতে পারো না। তাইতো বেশিকিছু চাওনা একতিল। তোমরা তোমাদের ভাগটুকু , প্রাপ্যটুকুই শুধু নেবে; এমনি প্রচণ্ড তোমাদের অভিমান! ... আমরা থাকবো না। আমরা চলে যাবো। আমরা এখানে থাকতে পারি না।
> (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ৩২৯)

দেশের ভবিষ্যৎ, চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ইতিহাস সম্পর্কিত উপলব্ধি তিনি তাঁর স্ত্রী মায়ার কাছে ব্যক্ত করেছেন এভাবে:

> ... মুসলমানদের আমরা কতটা প্রচণ্ড ঘৃণা করে এসেছি, সেই বক্তিয়ার খিলজির গৌড়বিজয়ের সময় থেকেই! যেখানে ভালো ব্যবহার করেছি সেখানে হয় আছে কোনো স্বার্থ আদায়ের চেষ্টা নয় কোন নিশ্চিত প্রতারণা। *(ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ৩৩০)

উপন্যাসে দেখা যায় বামপন্থী মোহাম্মদ আলী ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ ও জাতির স্বার্থ বড় করে দেখেছে। কিন্তু তার বন্ধু রেজা, মজিদ ভিন্নপথের অনুসন্ধানী হয়েছে, অথচ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও সম্পৃক্ত থাকেনি।

[১] মুহাম্মদ ইদরিস আলী, *আমাদের উপন্যাসে বিষয় চেতনা:* বিভাগোত্তর কাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

লক্ষণীয়, ঔপন্যাসিক প্রাথমিক পর্যায়ে দুর্ভিক্ষ, অনাহার ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট জোহার পরিবারকে গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে আসলেও মধ্যবিত্তের সংকটময় বৃত্তে ও রাজনৈতিক জটাজালের মধ্যে জোহা ও তার পরিবারকে অনুপ্রবেশ করাননি। মধ্যপর্যায়ে দেশবিভাগের প্রেক্ষাপট ও রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি উপস্থাপনের প্রয়াস পেলেও শেষাবধি জোহা ও তার পরিবারের অনিশ্চয়তা ও অমীমাংসিত নিয়তিকেই বেছে নিয়েছেন ঔপন্যাসিক।

উপন্যাসের অন্তিম পর্যায়ে দেখা যায়, প্রিয় বোন জহুকে সন্ধানের জন্যে চট্টগ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করে জোহা। সে বোনকে ছাড়া কোনো অবস্থাতেই বাড়ি ফিরবে না। 'পতিতাপল্লির নিমজ্জমান অন্ধকারের জহুকে সন্ধান করতে করতে জোহা মহামারী-আক্রান্ত পরিবেশে সদ্যভূমিষ্ঠ সন্তান ও তার জননীকে আবিষ্কার করে।'[১] উপন্যাসে এতৎসংক্রান্ত একটি এলাকা লক্ষণীয়:

> ... আকাশ মাটি গাছপালা তমসার আড়ালে লুপ্ত, কোনোদিকে একবিন্দু আলো নেই; কাছেই সমস্বরে ডাক ছাড়ে একপাল শেয়াল, এবং কুকুরটাও। কম্বলের একটা প্রান্ত তুলে তার ভিতরে গেল, জোহা নির্জীব ভাবে পড়ে থাকা মেয়েটির উরুতে কনুই চেপে জমাট হয়ে বসে; বাচ্চাটিকে টেনে নিজের কোলের কাছে আনল। জীবন্ত মাংসের গন্ধেই বুঝি শৃগালের ডাকে হিংস্র উল্লাস ঝরে, কিন্তু আশ্চর্য কোন্ অজানা রহস্যে জানে না , সে এখন যেন বাঘের চেয়েও সাহসী; জননীর গায়ে গা চেপে এবং শিশুটিকে পরমযত্নে আগলে দারুণ শীতে অন্ধকারে বসে থাকে ভোরের প্রতীক্ষায়।*(ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ৩৬২)

এভাবে 'এক অন্তহীন প্রতীক্ষা ও সম্ভাবনার ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে উপন্যাস শেষ হয়।'[২]

ক্ষুধা ও আশা উপন্যাসটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দেশবিভাগের পটভূমিতে রচনা করেছেন ঔপন্যাসিক আলাউদ্দিন আল আজাদ। বৃহৎ আকারের এ মহাকাব্যধর্মী উপন্যাসে সুসংবদ্ধ কোনো একক কাহিনি নেই। এ উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাসে ও চরিত্রসৃজনে আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রধানত ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ। অবশ্য জোহার গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনযন্ত্রণা প্রকাশের সূত্রে ঔপন্যাসিক জোহা চরিত্রের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে ঘটনা ও চরিত্রকে করে তুলেছেন স্বতন্ত্র ও পরিণামমুখী।

---

[১] রফিকউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

[২] রফিকউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আলাউদ্দিন আল আজাদ ক্ষুধা থেকে উত্তরণে আশার কোনো সংবাদ শোনাতে পারেননি; কিংবা কোনো অর্থবহ ইঙ্গিতও প্রদান করেননি। একজন মার্কসপন্থী লেখক হিসেবে নিম্নবিত্ত শ্রেণির সমস্যা, বুর্জোয়া শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশের চিত্রাঙ্কনের মধ্যেই তিনি সীমাবদ্ধ থেকেছেন, দরিদ্র মানুষগুলোর হতাশা, দুরাশা, শূন্যতার শেষ কোথায়– তার মীমাংসার পথ তিনি এড়িয়ে গেছেন। সুতরাং শিল্প-সাফল্য বলতে যে বিষয়টিকে অনুমান করি তা আলাউদ্দিন আল আজাদের ভাবনা-চিন্তায় অস্পষ্ট। বলাবাহুল্য, 'লেখক উপন্যাসে মধ্যবিত্তের জন্য কোন আশার চিত্র উপস্থাপিত করেননি। অঘোর চ্যাটার্জি, লিনার বাবা আলী মতুর্জা চৌধুরীদের মতো প্রবীণরা যেমন, তেমনি নবীনরাও কেউ যথাযোগ্যভাবে আশা ও সম্ভাবনার কোনো ছবি তুলে ধরতে পারেননি। এর একটি বড় কারণ তাদের কোনো নির্দিষ্ট প্রত্যয় নেই। জোহাদের জীবনে দুঃসহ যন্ত্রণা নেমে এসেছে কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক মুক্তি কোন পথে আসবে তার কোনো উল্লেখ নেই।'[১]

উপন্যাসে দুর্ভিক্ষপীড়িত অসংখ্য মানুষের দুর্দশার চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে, কিন্তু উদ্বাস্তু মানুষের বেঁচে থাকার মূলমন্ত্র কী হবে, কী আশায় তারা বেঁচে থাকবে তা অস্পষ্ট। সুতরাং "দেখা যাচ্ছে, 'ক্ষুধা ও আশা'র বক্তব্যে থাকা উচিত ছিল একটি সুনির্দিষ্ট রাজনীতিক চেতনার কথা। যেমন–মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জীয়ন্ত'-এ রয়েছে। তার উপন্যাসে পাঁচুর মতো কৃষকের ছেলে নিজের শ্রেণির স্বার্থরক্ষায় এগিয়ে গিয়েছে কিন্তু এমন কোনো স্পষ্ট বক্তব্য এখানে না থাকার জন্য অনেক চরিত্র বিশেষ করে মূল চরিত্র বাস্তব হয়নি। ফলে উপন্যাসও সার্থক হয়নি।'[২]*ক্ষুধা ও আশা* উপন্যাসে কাহিনি বর্ণনে কোনো শৃঙ্খলা আরোপ করা হয়নি। সাত পরিচ্ছেদের এই উপন্যাসটিকে নিম্নোক্ত পর্যায়ে বিন্যাস করা যেতে পারে। যেমন:

এক. পরিচ্ছেদ : ১-পরিচ্ছেদ ৪; রতনপুর গ্রামে দুর্ভিক্ষ, জোহা ও তার পরিবারের ঢাকা শহরে গমন ও বেঁচে থাকার সংগ্রাম ও বিচিত্র জীবনের সঙ্গে পরিচয়।

দুই. পরিচ্ছেদ : ৪-পরিচ্ছেদ৬; মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ; নাগরিক জীবনযন্ত্রণা; দেশবিভাগ, যুদ্ধ ও স্বাধীনতার সংগ্রামের আভাস, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, সাম্যবাদী চিন্তা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতিফলন।

তিন. পরিচ্ছেদ : ৭- নাগরিক জীবনযন্ত্রণা ও স্বজনদের হারিয়ে জোহা ও মা ফাতেমার

[১] নাজমা জেসমিন চৌধুরী, *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, মুক্তধারা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮০, ঢাকা, পৃ. ২৯৯-৩০০
[২] নাজমা জেসমিন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০

রতনপুর গ্রামে প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত।

স্পষ্টত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময় থেকে দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত এদেশীয় মানুষের জীবন সংগ্রামের কাহিনিসূত্রে উপন্যাসটি নির্মিত হয়েছে।

ক্ষুধা ও আশা উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র জোহা। উপন্যাসের প্রত্যেকটি ঘটনার দর্শক সে। তাই জোহা চরিত্রটি সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। 'জোহা চরিত্রটি বয়োবৃদ্ধ নয়, অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ। তার কিশোর জীবনের অভিজ্ঞতা তার বয়সের পরিধিকে অতিক্রম করেছে। সে যে-যুগের মানুষ তখন প্রতিটি দিনই মানুষের নবজন্মের দিন; অভিজ্ঞতার স্তর অতিক্রমণের এমন তড়িৎ-প্রবাহ বিপর্যয় লগ্নেই সম্ভব। সাময়িক কালের পটভূমিতে জোহার ভাবনাচিন্তা, তার আবেগ-অনুভূতি, তার কৌতূহল এবং উদ্দামতা, তার সংগ্রামমুখরতা ও কর্মকাঠিন্য তার চরিত্রকে জীবন্ত ও বলিষ্ঠ করে তুলেছে।'[১]

জহু চরিত্রটি সামাজিক অপব্যবস্থার নিষ্ঠুর শিকার। সকল কষ্ট, যন্ত্রণাকে সম্বল করে সে গণিকালয়ে সমর্পিত হয়েছে অস্তিত্বের সংগ্রামে টিকে থাকার জন্য। যে জীবন শুধুই অন্ধকারের, সে জীবনই হয়ে উঠেছে তার নিয়তি। হানিফ চরিত্রটি রতনপুর গ্রামের পরিবেশের সঙ্গে মিশে-যাওয়া একজন কৃষিজীবী, কিন্তু শহরে কাজের সন্ধানে এসে সে বরণ করেছে অপমৃত্যু।

ফাতেমা জীবনসংগ্রামের প্রতিটি মুহূর্তে সম্মুখীন হয়েছে কঠিন বাস্তবতার । ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ফাতেমা চরিত্রটি উজ্জ্বল ও আলোড়িত। মোহাম্মদ আলী, অঘোর চ্যাটার্জি, লিনা, সুজাতা, রেজা, অরুণ, আলী মতুর্জা চৌধুরী, মায়া প্রভৃতি চরিত্র ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে নির্মিত হলেও সম্পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠতে পারেনি। এইসব চরিত্রের মধ্যে আশাব্যঞ্জক কিংবা ইতিবাচক কোনো মাত্রা প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছেন ঔপন্যাসিক। '*ক্ষুধা ও আশা*-র চরিত্রপাত্ররা বহিরঙ্গের পরিবর্তে অন্তর্জগতে ক্রিয়াশীল হওয়ায় চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিশ্লেষণ। মেধার সুনিয়ন্ত্রিত অনুশাসন উপন্যাস বিধৃত বিচিত্র ঘটনাস্রোতে কেন্দ্রাভিমুখী গতি সন্ধান করেছে। ছবির পরিবর্তে এসেছে বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতা, দেখার

[১]মনসুর মুসা, *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*, অ্যাডর্ণ পাবলিকেশন, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, জুলাই-২০০৮, ঢাকা, পৃ. ৯২

পরিবর্তে বিন্যস্ত হয়েছে অবলোকন ও সন্ধানের অন্তর্মুখ-গভীরতা।'[১] দরবেশ চাচা, পাগলা মাস্টার, মিঠু চরিত্র খণ্ড ও অসম্পূর্ণ চরিত্র। এ উপন্যাসে চরিত্রগুলো বিকাশের প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ঔপন্যাসিকের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কারণে চরিত্রগুলো হয়ে পড়েছে অনুজ্জ্বল। কিন্তু এই তিনটি চরিত্র উদ্দীপ্তি, অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ জুগিয়েছে জোহা চরিত্রের মধ্যে। একটি দৃষ্টান্ত:

> তোমরা জাগো, ওঠো, চলো আমরা সামনের পানে এগিয়ে চলি, আলোকের তীর্থে!'
> *(ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ৩৩৯)

ক্ষুধা ও আশা উপন্যাসে মোহাম্মদ আলীর রাজনৈতিক চিন্তা ও চেতনায় মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ স্পষ্ট। অঘোর চ্যাটার্জি অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী হলেও অন্তর্জগতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে বিক্ষত। রেজা, অরুণ সাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী উঠতি তরুণ। ঔপন্যাসিকের অন্তর্দর্শনে প্রতিফলিত হয়েছে বামতান্ত্রিক রাজনৈতিক চেতনা ও শ্রেণি সংগ্রাম। তবে 'ক্ষুধা ও আশা-র অধিকাংশ চরিত্রই ঘটনানিয়ন্ত্রিত, সময়শাসিত।'[২]

'আলাউদ্দিন আল আজাদের ক্ষুধা ও আশা সম্পর্কে স্বতন্ত্র মন্তব্য প্রয়োজন। এপিক-এর সাথে এর সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রেও ব্যবধান আছে—যেমন ব্যবধান ইলিয়াড এবং ওডেসির মধ্যে। ইলিয়াডে বিষয়, ঘটনা এবং চরিত্রের ব্যাপ্তি, ওডেসিতে ব্যক্তির অভিজ্ঞতার প্রসারতা ও গভীরতা। ক্ষুধা ও আশাও ব্যক্তির গভীরতর অন্তর্জীবনের এপিক।'[৩]

'জীবনের পরিব্যাপ্ত সময় এবং ব্যাপমান সমাজের সামূহিক (collective) অভিজ্ঞতা থেকে এপিক ফর্মের জন্ম হয়। Epic একটি সমাজের উত্থানপর্বের আকাঙ্ক্ষিত পর্যায়ের শিল্পনির্মাণ।'[৪] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর গ্রাম ও শহরের পটভূমিকে কেন্দ্র করে নিম্নবিত্ত শ্রেণির সংগ্রাম এবং মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ *ক্ষুধা ও আশা* উপন্যাসে জোহার অতীত স্মৃতি, বর্তমান বহির্বাস্তবতা, মনোজাগতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্জাগতিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশের মাধ্যমে অস্তিত্ববাদী দর্শনরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। 'প্রথাগত আঙ্গিকের অনুসরণ সত্ত্বেও *ক্ষুধা ও আশায়* ঔপন্যাসিকের অঙ্গীকারের পরিধি যুদ্ধোত্তর শিল্পরীতি পর্যন্ত প্রসারিত। দৃষ্টিকোণ ও

---

[১] রফিকউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১-২০২
[২] রফিকউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১
[৩] সৈয়দ আকরম হোসেন, প্রসঙ্গ: *বাংলা কথাসাহিত্য*, '*বাংলাদেশের উপন্যাস: আঙ্গিক বিবেচনা*,' মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৯৭, ঢাকা, পৃ. ১১৪
[৪] সৈয়দ আকরম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

পরিচর্যা, প্লটবিন্যাস, চরিত্রায়ণ, সময়ের ব্যবহার, এমন কি ভাষারীতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই যুদ্ধোত্তর নব-আঙ্গিকের অনুসরণের পরিচয় সুস্পষ্ট।'[১]

ক্ষুধা ও আশা উপন্যাসটি জোহার প্রেক্ষণবিন্দু থেকে বিন্যস্ত। জোহার স্মৃতি ও জীবন সংগ্রামের ভাবনাস্রোতে আন্দোলিত হয়েছে এ উপন্যাসের প্রতিটি ঘটনাবর্ত। যুদ্ধোত্তর পরিবেশে, শহরে বিচিত্র মানুষের উদ্দামতা ও জাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবিম্বিত হয় জোহা। লেখক এ উপন্যাসে গীতময় অনুষঙ্গে জোহার অন্তর্ভাবনা উপস্থাপন করেছেন এভাবে:

> জোহা চলছে, পেটে খিদে, কিন্তু দু'চোখে অপার বিস্ময়ের ছায়া, লোকজনের চলাফেরায় যেন নতুন চাঞ্চল্য, গলার স্বর মধুর সুন্দর তির্যক; অন্য দিনের চাইতে অনেক উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে সকালবেলার রং। গাছে গাছে সবুজের সমারোহ, পাখির কাকলি। মৃদুমন্দ হাওয়া কচিপাতা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে যেন বলছে কোন্ দূর ছায়াময় বনানীর ভাষা, আধো-জাগরণে বিস্মৃত স্বপ্নের অনুরণনের মতো। জোহা হাঁটছে: এক-পা দু'পা করে হাঁটছে, নির্বাক, মেঘের ছায়ার সঞ্চরণ যেন: পথের মোড়ে শিরীষ গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে দেখল কিছুদূরে সহস্র লোকের জনতা, উত্তুরে বাতাসে উত্তাল বৈশাখী নদীর ঢেউয়ের মতো উঠছে পড়ছে। ও স্থির থাকতে পারে না, নিশানের মতো একটা হাত উঁচু করে ধরে ছুটে গেল। (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ৩৩৮-৩৩৯)

উপর্যুক্ত বর্ণনাংশে নিসর্গ আর অগুনতি জনতার প্রতি জোহার প্রবল আকর্ষণের চিত্র পরিবেশিত হয়েছে। মুক্তিকামী জনতার আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে নতুন স্বপ্ন দেখার চেষ্টায় মগ্ন সে।

উপন্যাসে প্রতীকী-চিত্রকল্পময় অনুষঙ্গ বয়নে আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রদর্শন করেছেন অসামান্য কৃতিত্ব। বাদশা কর্তৃক জহুর বলাৎকারের ঘটনা সম্পর্কিত বর্ণনাংশ এতৎপ্রসঙ্গে লক্ষণীয়:

> এ সময় তীব্র তীক্ষ্ণ চাবুকের মতো বিজলি খেলে যায়। বেলগাছের একটি ডাল বার বার আছড়ে পড়ছে পিছনের রেলিংয়ের ওপর হাওয়ার ধাক্কায় এত বড় দালানটাও কেঁপে কেঁপে উঠেছে একেকবার। ঝরঝর বর্ষণের পানি রাস্তার ওপর থেকে নর্দমার মুখে গিয়ে পড়ছে প্রবল ধারায়; নর্দমার মুখের কাছেই বস্তির গলি, এবং বস্তির ভিতরে ফাঁকা জায়গায় একটি কারখানা। ওখানে গিয়ে কি হবে এখন, তবু চেষ্টার শেষ নেই; একটা কালো ট্রাক রাস্তার স্রোত ঠেলে ঠেলে হুশহুশ করে কোনক্রমে গলির মুখ পর্যন্ত যায়, কিন্তু ওখানেই থেমে পড়ে। নর্দমার মুখের কাছেই গলির

[১]রফিকউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

মুখ। নর্দমার মুখটা মাপসই কিন্তু গলির মুখটা ছোটো এত ছোটো, এতবড় গাড়িটা কেমন করে যাবে ড্রাইভার হয়ত ভাবেনি। *(ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ২৭৮)

জহুর স্মৃতিমন্থনসূত্রে উপস্থাপিত হয়েছে গ্রামীণ লোকজসংস্কৃতির খণ্ড খণ্ড চিত্র। গ্রামকেন্দ্রিক বিয়ের আয়োজনকে ঔপন্যাসিক জহুর মগ্নচৈতন্য উৎসারিত ভাবনাপ্রবাহের মাধ্যমে দেখিয়েছেন এভাবে:

জেওর শাড়ি সাবান। ... মেহেদি নিয়ে কাড়াকাড়ি। ফুলের মালা বানাবার ধুম। একপাল মেয়ে পাদি, মুঠ মুঠ খই ছিনাই-কাডা দই! কিন্তু সবচেয়ে মজা জামাইকে ভেড়া বানানো। বেড়া ফাঁক করে বাসর ঘর দেখাও মন্দ না। ... মণ্ড মিঠাই এল, আর কত রকম পিঠা। বাড়ির বাইরের পথের বাতাসও গন্ধে ভুরভুর। ... বিয়ের দিন জামাই আড়াই সের সুপারি, দশবিড়া পান আর দশসেরি একটা রুই পাঠিয়েছিল। চলনে এসেছিল চার বেহারার পাল্কিতে চড়ে সঙ্গে সাতটা বন্দুক। (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ২৪৪)

ক্ষুধা ও আশা উপন্যাসে ব্যবহৃত উপমা-অলংকার ঘটনা ও চরিত্র ও পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক। তার কয়েকটি নিম্নরূপ:

১. একেকজনের শরীরের যা হাল, সুটকির মতো চিমসে গেছে, যেন একেকটি জ্যান্ত কংকাল। (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ২২৭)

২. সত্যি মিঠুর জন্য মায়া লাগে। চেহারাটা মিষ্টি সেজন্য নয়, মেজাজটা ওর চিনির মতো। (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ২৩৮)

৩. পরদিন দুপুরে বাঘের মতো রোদ উঠল। (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ২৪৩)

৪. ছেলেটা কি দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল! কবিতায় পড়া বীর নৌজোয়ানেরই মতো। (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ২৫৪)

৫. বাইরে কালো পোকার মতো ছেলেমেয়েরা জটলা করছে। (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ২৬৩)

৬. দেখতে দেখতে ইঞ্জিল কাঠবিড়ালের মতো তরতর করে একটা গাছে উঠে পড়ল। (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ২৬৪)

৭. শকুনের মতো মানুষগুলো হাঁটছে হাত নাড়ছে করছে, করছে বকাবকি। (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ২৬৫)

৮. জহু দাঁড়িয়ে থাকে জড় পদার্থের মতো; কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন সাপের মতো খোলস পালটে নতুন মানুষ হয়ে উঠেছে। (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ২৬৬)

৯. চড়ুইয়ের বাচ্চার মতো চিচি স্বরে আয়েশা কত কেঁদেছিল! (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ২৬৭)

১০. আসলে গরীব বাঁচবে না-বাঁচতে পারে না; রাস্তায় রাস্তায় এখন যেমন ডাস্টবিনের ময়লা খাচ্ছে, আর মরছে কুকুর বেড়ালের মতো, এই তাদের ভাগ্য। (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ২৭০)

১১. দেখে ওর ঘুমন্ত মুখটা, ম্লান চাঁপাকলির মতো। (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ২৯৫)

১২.শহর তাকে ছুঁড়ে ফেলেছিলো আর্বজনাপিণ্ডের মতো, এখন আবার শহরে ফিরে যাচ্ছে। (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ৩০০)

১৩. একটুও ভয় করছেনা ওর; সে যেন এখন শঙ্খিনীর মতো। (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ৩১৭)

১৪.লিনার সমগ্র সত্তা চৈতালি ঘূর্ণির মতো কখন পাক খেতে শুরু করলো সে জানে না। (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ৩২৭)

১৫. টুলের ওপর কাঠের মূর্তির মতো বসে আছে মোহাম্মদ আলী। (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ৩২৭)

১৬. শেষ পর্যন্ত যখন বেরিয়ে পড়েছে নিজেকে লাগছে এখন আকাশে ওড়া একফালি তুলোর মতো। (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ৩৫৪)

১৭. এরপর লোকটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে মিলিয়ে গেল কালোছায়ার মতো। (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ৩৬১)

উপন্যাসে বেশ কয়েকটি গীত-গান ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক। গ্রামীণ সংস্কৃতি, অন্তর্যন্ত্রণা, আনন্দ-উল্লাস. দুঃসময় প্রভৃতি অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে এসব গান :

১. লাইলি আমারে ডাকে নিশিদিন আমি যে তারই মজনু দীনহীন! (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ২৪৫)

২. আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পূর্ণ করো। (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ৩১৮)

৩. আমার মল্লিকাবনে যখন প্রথম ধরেছে কলি- (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ৩২৫)

৪. কান্দিস্ নারে ভোলামন, ও তুই কান্দিস্ নারে। কান্‌লে পরে চক্ষু ভরে যাইবে আবে, দেখবিনারে মানবরতন, ও তুই কান্দিস্ নারে। (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ৩৫৯)

৫. এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি, সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি। (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ২২৯)

'*ক্ষুধা ও আশা*'র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এর ভাষা। শব্দচয়ন, বাক্যগঠন এবং পরিবেশ-বৈচিত্র্য উপন্যাসকে স্বকীয়তা দান করেছে। পূর্ব বাঙলার গ্রামীণ শব্দ এবং এতদিন অবহেলিত এ দেশের নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুখের ভাষার উচ্চকিত ব্যবহারে পরিশুদ্ধ হয়ে উঠেছে।'[১] গ্রামকেন্দ্রিক মানুষদের আচার-আচরণ-উচ্চারণ উপন্যাসে অসামান্য শব্দ ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত। যেমন: 'বেটির জিদ বড় কড়া,' 'লেহাপড়া করলে বহুৎ বড় আইত পারব,' 'চ্যাংড়া বয়স,' 'নাকি ফষ্টিনষ্টি শুরু করেছে,' 'নডি বানায়, নডি' প্রভৃতি।

আঞ্চলিক কথ্য বাগভঙ্গি নির্মাণেও অসামান্য স্বাক্ষর রেখেছেন ঔপন্যাসিক। যেমন:

১. 'ব্যাডা! বাইর অ তুই, বাইর অ। নাইলে কুড়াল মাইরা মাথা ফাঁক কইরা ফালামু।' (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ২৪৫-২৪৬)

২. কইয়াম আর কি, বুঝবার পারনা? একটু ভালা বেডি-মানুষ দেখলে ধইয়া লইয়া যায়, কেনাবেচা

[১]মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

করে, চালান দেয়– (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ২৮১)

৩. 'অহন হুইত্যা থাক, বিয়ান অইলে আমি দিয়া আইয়ুমনে। অহন তো আন্ধার, পথ চিনতে পারবে না।' (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ২৮০)

'মানব-চৈতন্যের উপর ঘটনার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে সংকেতে, কখনো প্রতীকে।'[১]একটি দৃষ্টান্ত:

> ... আকাশ মাটি গাছপালা তমসার আড়ালে লুপ্ত, কোনোদিকে একবিন্দু আলো নেই; কাছেই সমস্বরে ডাক ছাড়ে একপাল শেয়াল, এবং কুকুরটাও। কম্বলের একটা প্রান্ত তুলে তার ভিতরে গেল, জোহা নির্জীব ভাবে পড়ে থাকা মেয়েটির উরুতে কনুই চেপে জমাটি হয়ে বসে; বাচ্চাকে টেনে নিজের কোলের কাছে আনল। জীবন্ত মাংসের গন্ধেই বুঝি শৃগালের ডাকে হিংস্র উল্লাস ঝরে, কিন্তু আশ্চর্য কোন্ অজানা রহস্যে জানে না, সে এখন যেন বাঘের চেয়েও সাহসী; জননীর গায়ে গা চেপে এবং শিশুটিকে পরমযত্নে আগলে দারুণ শীতে অন্ধকারে বসে থাকে ভোরের প্রতীক্ষায়। (*ক্ষুধা ও আশা*, পৃ. ৩৬২)

আলাউদ্দিন আল আজাদের *ক্ষুধা ও আশা* বিভাগোত্তর উপন্যাস-সাহিত্যে স্বতন্ত্র; বিষয়গৌরবে উজ্জ্বল। এপিক ফর্মের কলেবরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমাজ-রাজনীতির রূপ-রূপান্তর চিত্রাঙ্কনের পাশাপাশি গ্রাম ও শহরের জীবনচিত্র শিল্পান্তর্গত করে পরিবেশনায় তিনি যে সফল হয়েছেন তা নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করা যায়।

[১]শাহীদা আখতার, *পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২, ঢাকা, পৃ. ১৮৮

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বাধীনতা-উত্তরকালের উপন্যাস

স্বাধীনতা-উত্তরকালে আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিসংখ্যানে বেশ সমৃদ্ধ। এই পর্যায়ের প্রায় সবকটি উপন্যাসে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসেছে মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ। মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের জীবনবাস্তবতার নানামাত্রিক বিশ্লেষণ সুপ্রত্যক্ষ হলেও প্রকরণ-পরিচর্যায় ঔপন্যাসিক এ-পর্যায়ে বিভাগোত্তরকালের উপন্যাসের তুলনায় অনেকটা উদাসীন কিংবা অমনোযোগী ছিলেন বলেই মনে হয়। স্বাধীনতা-উত্তরকালে রচিত তাঁর উপন্যাসসমূহ হচ্ছে *খসড়া কাগজ*, *শ্যামল ছায়ার সংবাদ*, *জ্যোৎস্নার অজানা জীবন*, *যেখানে দাঁড়িয়ে আছি*, *বিপরীত নারী*, *কায়াহীন ছায়াহীন*, *স্বাগতম ভালোবাসা*, *অপর যোদ্ধারা*, *পুরানা পল্টন*, *পুরুদ্রুজ*, *ক্যাম্‌পাস*, *অনূদিত অন্ধকার*, *স্বপ্নশিলা*, *অন্তরীক্ষবৃক্ষরাজি*, *প্রিয় প্রিন্স*, *কালোজ্যোৎস্নায় চন্দ্রমল্লিকা*, *বিশৃঙ্খলা*, *ঠিকানা ছিল না*, *তোমাকে যদি না পাই*, *হলুদ পাতার ঘ্রাণ* প্রভৃতি।

খসড়া কাগজ

খসড়া কাগজ[১] (১৯৮৩) উপন্যাসের কাহিনি একাধারে রাজনীতি ও লিবিডো। কেন্দ্রীয় চরিত্র লিলির অন্তর্দ্বন্দ্বময় জীবন স্বরূপই এ উপন্যাসের উপজীব্য। নগরজীবনের পটভূমিকায় একজন অসহায় নারীর জীবন কাহিনি উপস্থাপনসূত্রে উপন্যাসে অভিব্যক্ত হয়েছে বামরাজনীতি, মুক্তিযুদ্ধ, চরমপন্থা, ব্যক্তিস্বার্থ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, লিবিডো প্রসঙ্গ প্রভৃতি।

[১] আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'খসড়া কাগজ', *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ২০০১, গতিধারা, ঢাকা। বর্তমান গ্রন্থে 'খসড়া কাগজ'-এর পাঠ এ সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে। স্বদেশ পত্রিকায় ঈদসংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত।

উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র লিলির বৈচিত্র্যময় জীবনকাহিনিকে কেন্দ্র করে উপস্থাপিত হয়েছে এ উপন্যাস। *খসড়া কাগজ* উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায়, শহীদ বুদ্ধিজীবী প্রদর্শনীতে বহু বছর পর অকস্মাৎ উপস্থিত হয়েছে তরুণ সাংবাদিক কাজল ও লিলি। এক সময় পাশাপাশি বাড়িতে বাস করতো তারা; পরস্পরকে পছন্দ করতো, ভালোবাসতো। অভিভাবকদের ফাঁকি দিয়ে দুঃসাহসিক অভিসারে ব্যস্ত সময় কাটাতো তারা। কিন্তু পলায়নপর মানসিকতা, কাপুরুষতা কিংবা অভিমানের কারণে কাজল শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেনি লিলিকে। তাছাড়া কাজলের পরিবার ছিল দারিদ্রসংকটে জর্জরিত। পরিবারের কথা ভেবে একপর্যায়ে বন্ধু কেরামতের সহায়তায় লন্ডনে প্রস্থান করে কাজল। লিলির ভালোবাসাকে এভাবে অবজ্ঞা করে সে। দুর্ভাগ্যক্রমে অতঃপর তারা যাপন করেছে বিচ্ছিন্ন জীবন। দীর্ঘসময়ের ব্যবধানে দেশে ফিরে লিলির সঙ্গে এমনভাবে দেখা হবে প্রত্যাশা করেনি কাজল। মধ্যবর্তী এই সময় পরিসরে লিলির জীবনে ঘটে যায় অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। এক ঘূর্ণিঝড়ের রাত্রিতে লিলিকে ধর্ষণ করে উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান ফয়সাল। অপ্রত্যাশিত সেই ঘটনার পর অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে সে। অনন্যোপায় লিলি এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাকে চাপা দেবার জন্যে দ্বারস্থ হয় বিপ্লবী নেতা আনোয়ারের। শেষ পর্যন্ত অন্তঃসত্ত্বা লিলিকে আশ্রয় দেয় আনোয়ার। কিন্তু বাম আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত আনোয়ার লিলির সঙ্গে শরীরী সম্পর্ক স্থাপন করলেও তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি। লিলিকে উদ্দেশ্য করে সে বলে –

> ... আমারে মাফ করে দাও লিলি, আমি পারবো না। আমি রক্ত শপথে আবদ্ধ। তা ভাঙতে পারবো না। বিপ্লব সংঘটিত না করে জীবনকে আমি চাইবো না। এই অঙ্গীকার। অন্য কাউকে পছন্দ কর। (*খসড়া কাগজ*,পৃ. ৪০৩)

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে অন্তঃসত্ত্বা লিলি জন্ম দেয় সন্তান টিনাকে। মুক্তিযুদ্ধের একপর্যায়ে হানাদারদের গুলিতে মারা যায় আনোয়ার। অতঃপর কামনা-বাসনাবঞ্চিত অতৃপ্ত জীবন বয়ে বেড়াতে হয় লিলিকে। বহু বছর পর কাজলের সাক্ষাৎ পেয়ে লিলির সেই অতৃপ্ত কামাবেগ দুর্বার গতিতে আত্মপ্রকাশ করে। একটি দৃষ্টান্ত:

> দু'হাতে আমার গলা জড়াল, মুখোমুখি, জড়ানো স্বরে বলল, একটা কথা রাখবে আমার ভূতুভাই, একটা কথা? এখন এই মুহূর্তে আমাকে তুমি গলা টিপে মেরে ফেল না? হ্যাঁ? আমাকে মেরে ফেলো। (*খসড়া কাগজ*,পৃ. ৩৭৯)

উপন্যাসের অন্তিম পর্যায়ে দেখা যায়, লিলির আপন চাচা চরমপন্থী বিপ্লবী নেতা সৈয়দ আবুল হাসান মৃত্যুশয্যায়। চাচাকে দেখার জন্যে লিলি ও কাজল ছুটে যায় সন্দ্বীপে। কিন্তু সেখানেও রহস্যময় কারণে কাজলের ভালোবাসার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয় লিলি। লিলির অসম্মতি কাজলকে ঠেলে দেয় অজানা গন্তব্যে। একটি দৃষ্টান্ত:

> আমি বললাম, আগামী রোববারেই তো চলে যাচ্ছি। যা তোমার ভালো লাগে, তাই করো। কিন্তু মনে রেখো, অনন্তকাল ধরে আমি তোমার, আমি তোমারই থাকবো। (*খসড়া কাগজ*, পৃ. ৪১০)

খসড়া কাগজ উপন্যাসে বিষয়চেতনায় আরও উপস্থাপিত হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অসহনীয় পরিস্থিতি, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে প্রবল স্বেচ্ছাচার, শত শত সাংবাদিকদের চাকরিচ্যুতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দেশের অর্থসম্পদ লুট, রাষ্ট্রনীতির প্যাঁচে একদলীয় শাসন পদ্ধতি, শহীদ পরিবারের অসহায়ত্ব প্রভৃতি প্রসঙ্গ।

খসড়া কাগজ উপন্যাসের পটভূমি মুক্তিযুদ্ধ; যুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও নগরজীবনের বাস্তবতা। সমাজের সর্বস্তরের যে-অবক্ষয় তা শিল্পরূপময় করে উপস্থাপনে সক্ষম হয়েছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ।

আলাউদ্দিন আল আজাদ *খসড়া কাগজ* উপন্যাসে কাহিনি পরিবেশনায় আত্মকথন পদ্ধতি বা উত্তমপুরুষের দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করেছেন। কাজলের জবানিতে সমগ্র কাহিনি বর্ণিত। উপন্যাসে কাজলই কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক চরিত্র। কথকতার কৌশলে স্মৃতির সূত্রে দীর্ঘ কাল-পরিসরের ঘটনা উপস্থাপনায় ঔপন্যাসিক দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন।

খসড়া কাগজ উপন্যাসে চরিত্রের সংখ্যা স্বল্প। ঘটনার প্রয়োজনেই চরিত্রসমূহ ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক। যেহেতু এ উপন্যাসের কাহিনি লিলির জীবনকথাকেন্দ্রিক, সেহেতু তাকে কেন্দ্র করে প্রত্যেকটি চরিত্র পল্লবিত হয়েছে। দেশপ্রেমিক আনোয়ার, মনোয়ার. কেরামত. কিসমত. উলফত,আফরোজা, এ.টি.এম শরাফতউল্লাহ, রমযান আলী খান, ফয়সাল, টিনা প্রভৃতি চরিত্র তেমন একটা বিকশিত হয়ে ওঠেনি। লিলির জীবনের নিয়তিকে ঔপন্যাসিক স্থান দিয়েছেন উপন্যাসকাহিনির কেন্দ্রমূলে।

আলাউদ্দিন আল আজাদ *খসড়া কাগজ* উপন্যাসে বাম রাজনীতি প্রকাশের পাশাপাশি ব্যবহার করেছেন ফ্রয়েডীয় লিবিডো । মার্কসবাদী চেতনার চেয়ে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব প্রয়োগে সফল হয়েছেন ঔপন্যাসিক। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনি বর্ণনায় লেখক লিবিডোকে মুখ্য বিষয়রূপেই গণ্য করেছেন, যা কখনো কখনো অস্বস্তিকর মনে হয়েছে। বিশেষত নারীদেহের বর্ণনায় লেখক অনেকবেশি আগ্রহপ্রদর্শন করেছেন। একটি দৃষ্টান্ত:

> কামাতুরা অধীর রমণী; ব্রা আগেই খুলে রেখেছিল, ব্লাউজের বোতাম আলগা, আমি দেখতে পাচ্ছি লোভনীয় সুগোল মসৃণ স্তনজোড়া, যেন আবেগেই একটু একটু দুলছে। এমন মুহূর্তে ক্রমান্বয়ে গভীর শৃঙ্গারে, আলিঙ্গনে, চুম্বনে, সংবাহনে, উত্তেজিত করে, দুরন্ত সঙ্গমে এমন একজন নারীকে সন্তুষ্ট করাই তো একজন পুরুষের কাজ। (*খসড়া কাগজ*,পৃ. ৩৭৯)

লিলির জীবনযন্ত্রণা প্রকাশের সূত্রে ঔপন্যাসিক কাজলের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে ঘটনা ও চরিত্রকে করে তুলেছেন বিচিত্রমুখী। হতাশাগ্রস্ত কাজলের দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হওয়ায় এ উপন্যাসের বর্ণনা মাঝে মাঝে হয়ে উঠেছে গীতময়। যেমন:

> ঝড়ের দমকা হাওয়ায় প্রাণের সবক'টি দরোজা–জানালা একসঙ্গে খুলে গেল। বসতে ইচ্ছে হলো না টেবিলে, আর, হারিকেনটা শিয়রের কাছে রেখে চিৎ হয়ে শোয়ার পর বইটি দু'হাতে বুকের উপরে মেলে ধরল। ... বইয়ের শাদা পাতার কালো অক্ষরগুলো পিঁপড়ের সার হয়ে সার বেঁধে যেন চলে যাচ্ছে। আলো কমিয়ে পাশ ফিরলে ভেসে ওঠে বেড়ার জানালা, হাস্নাহেনা গাছ। এবং অন্ধকার। পুকুরের ওধার থেকে ভেসে আসছে ঝোঁপঝাড়ের বুনোগন্ধ। আরো কিছুদূরে পাহাড়তলীর টিলার উপরে, বাংলোতে টিম্‌টিম্ বাতির ঝালর। অমন করছে কেন ভিতরটা, একি সুখ না দুঃখ? হাসি না অশ্রু? আনন্দ না বেদনা? হয়তো সবকিছুই, একসঙ্গে, কেবল একটা আচ্ছন্ন প্রদাহ। (*খসড়া কাগজ*,পৃ. ৩৮৪)

খসড়া কাগজ উপন্যাসের পটভূমি, চরিত্র, ঘটনা এবং বক্তব্যবিষয়ের সঙ্গে ভাষার যোগ চমৎকার। চরিত্রচিত্তের জীবনবাস্তবতা অঙ্কন প্রসঙ্গে লেখক সহজ, সরল ও নিরাভরণ ভাষা ব্যবহার করেছেন।

আলাউদ্দিন আল আজাদ শিল্পদৃষ্টিতে যে হ্যাঁ-বাচক জীবনবোধে বিশ্বাসী, সে বিশ্বাসই রূপায়িত হয়েছে খসড়া কাগজ উপন্যাসে। লিলির আত্মপ্রত্যয় ও প্রেম-প্রত্যাখ্যান কাজলের জীবনকে অনিশ্চয়তার পথে ধাবিত করলেও শেষ পর্যন্ত স্বপ্নজগতের মধ্যে আলোর বার্তার কথা ব্যক্ত করেছেন ঔপন্যাসিক। সর্বোপরি উপন্যাসপাঠের যে আনন্দ, তা *খসড়া কাগজ* পূরণ করতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

অপর যোদ্ধারা

আলাউদ্দিন আল আজাদের *অপর যোদ্ধারা*[১] (১৯৮৩) উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত। উত্তম পুরুষে রচিত এই উপন্যাসের পটভূমিরূপে মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়কাল গৃহীত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রাকপর্যায়ের রাজনৈতিক আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধকালীন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, রাজাকারদের অপতৎপরতা, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশে বিশৃঙ্খলা, ব্যাংক লুট, হত্যা, ছাত্ররাজনীতি, প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের পরাজয় বরণ ও অসহায় জীবন-যাপন, স্বাধীনতা-বিরোধী চক্রের ষড়যন্ত্র প্রভৃতি শেখ রহমত আলির স্মৃতিকথনের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। *অপর যোদ্ধারা* উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ও নামকরণের প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের বক্তব্য:

> অপর যোদ্ধাদের জন্ম একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বর। আমি তিয়াত্তরের ষোলই জুলাই অধ্যক্ষ হিসেবে ঢাকা কলেজে যোগদান করেছিলাম, তখন তাদের কয়েকজনকে চোখের সামনে পাই। তারা ছিল আমার ছাত্র, আমাদের নতুন প্রজন্ম,: তারা আমাকেও আঘাত করেছিল, দুঃখ দিয়েছিল, তবু পরবর্তীকালে তাঁদের করুণ পরিণতির কথা যখন শুনেছি অশ্রু সম্বরণ করা সম্ভব ছিলো না।[২]

অপর যোদ্ধারা উপন্যাসের ঘটনাংশ উন্মোচিত হয়েছে কেন্দ্রীয় চরিত্র মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার আলি ওরফে দুলালকে উপলক্ষ করে। গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে ওঠা বীর মুক্তিযোদ্ধা দুলাল স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে কীভাবে নিষ্ঠুর ও বেদনাদায়ক পরিস্থিতির শিকার হলো–তা বর্ণনায় প্রাজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। উপন্যাসের মুখবন্ধ অংশে স্বয়ং ঔপন্যাসিক বলেছেন:

> হ্যাঁ, অতিরিক্ত মূল্যে কেনা আমাদের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার জন্য সম্মুখ যুদ্ধে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন ইতিহাসে তাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, যাঁরা অজ্ঞাত পরিচয় শহীদ তাঁদের জন্য আমরা নির্মাণ করেছি জাতীয় স্মৃতিসৌধ। আবার নতুন করে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়ন

---

[১]আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'অপর যোদ্ধারা', *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বরর ২০০০, গতিধারা, ঢাকা। বর্তমান গ্রন্থে 'অপর যোদ্ধারা' উপন্যাসের পাঠ এ-সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে। স্বদেশ ঈদসংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ সালে।

[২]আলাউদ্দিন আল আজাদ, ভূমিকা অংশ, *অপর যোদ্ধারা*, *পুরানা পল্টন*, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯২, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, পৃ. ৭

> হচ্ছে, কালক্রমে তাঁরাও নিশ্চয়ই পুনর্বাসিত হবেন। কিন্তু অপর যোদ্ধারা? তাদের খবর কি, তা'রা কোথায়?[১]

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময়ে মধুমিঞা হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ঢাকার আদর্শ কলেজে ভর্তি হয় দুলাল। কলেজে অবস্থানকালে সহপাঠী আশরাফ ও কামরানের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় তার। এ-পর্যায়ে ঢাকার রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তাল হতে থাকে। পঁচিশের কালোরাত্রিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে অনেক মানুষ প্রাণ হারায়। এ-ভয়াবহ পরিস্থিতিতে শহরত্যাগী লোকজনদের সঙ্গে গ্রামে ফিরে আসে দুলাল। কিন্তু গ্রামেও স্বস্তি নেই। এ অস্থির পরিস্থিতিতে গ্রামের লোকজন নিয়ে সে ট্রেনিং নিতে চলে যায় ভারতের আগরতলায়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও দালালদের দৌরাত্ম্য থাকা সত্ত্বেও নিরাপদে পৌঁছে যায় ট্রেনিং ক্যাম্পে। কিন্তু ট্রেনিং ক্যাম্পে পৌঁছানোর পর সাময়িকভাবে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যার সম্মুখীন হয় দুলাল ও তার বাহিনী। আওয়ামী লীগের নেতার স্লিপ ছাড়া গেরিলা ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি হওয়া যাবে না শুনে হতাশায় মুষড়ে পড়ে তারা। সমস্ত জটিলতা দূর করে অম্পিনগর ক্যাম্প থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয় তারা। প্রশিক্ষণ শেষে দেশমাতাকে হানাদারমুক্ত করতে তারা অংশগ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধে। একসময় মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। বিশ্বমানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময় পরিসরে অনাকাঙ্ক্ষিত বাস্তবতার মুখোমুখি হয় দুলাল। সে লক্ষ করে নির্মাণ কিংবা সৃষ্টির পরিবর্তে পুরো বাংলাদেশকে গ্রাস করে নিচ্ছে ধ্বংস ও বিপর্যয়:

> এই যুদ্ধ ছিল জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, এই যুদ্ধ ছিল ছিনিয়ে আনতে স্বাধীনতার সূর্য, যার নিচে গড়ে উঠবে শ্রমে ঘামে সৃষ্টির আবেগে ও কল্পনার শোষণমুক্ত মানুষের সুখী জীবন। এই যুদ্ধ কি ছিল আত্মধ্বংসের জন্য? (*অপর যোদ্ধারা*, পৃ. ৩২)

মুক্তিযুদ্ধকালেও দুলাল মুখোমুখি হয়েছে অনেক ভয়ংকর দৃশ্যের। মুক্তিযুদ্ধের সময় যেমন দেখেছে ঠিক তেমনি মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়েও তাকে দেখতে হচ্ছে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির ব্যাংক লুট, ছিনতাই, পকেটমার, হত্যার মতো জঘন্য অপরাধ। এতৎপ্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের ভাষ্য:

> ... ওই রাস্তার মোড়ে সোনালী ব্যাংকের শাখা ওটা, লুট করে দুস্কৃতিকারীরা ... শাদা টয়োটা গাড়িটার কাছাকাছি দুইজন যুবকের লাশ, তাদের নাকে মুখে চোখে রক্ত জমাট বেঁধে যাচ্ছে।

[১]আলাউদ্দিস আল আজাদ, 'মুখবন্ধ', *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

> ...শান্তিরক্ষাকারী একটি ছোট্ট বাহিনী গাছতলায় জিপ থামিয়ে দেখছে, আর মাঝে মাঝে হুইসেল দিচ্ছে। (*অপর যোদ্ধারা*, পৃ. ৩৬-৩৭)

মুক্তিযোদ্ধা দুলাল ব্যাংক লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু জনতা শেষ পর্যন্ত তাকে দুষ্কৃতকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং দিয়েছে গণপিটুনি । অথচ একসময় এ-দুষ্কৃতকারীদের জনতার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল দুলাল। দুর্ভাগ্যক্রমে তারাই তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছে। কলেজ-সহপাঠী আশরাফই তাকে দুষ্কৃতকারী বলে চিহ্নিত করেছে এবং বন্দি করেছে। তাদের সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের বক্তব্য:

> ওরা অস্ত্র পেয়েছে সহজভাবেই কিন্তু শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেনি একদিনও। ওরা কোন সেক্টরে যায়নি, যুদ্ধ করেনি অথচ এরাই এখন নেতৃস্থানীয় দুই মুক্তিযোদ্ধা। (*অপর যোদ্ধারা*, পৃ. ৩৯)

বন্দিদশায় দুলাল নিজেকে কখনও বাঁচাবার চেষ্টা করেনি। দারোয়ান সিকান্দার তাকে মুক্ত করার কথা বললেও সে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছে। কারণ তাকে না পেয়ে ওরা যদি সিকান্দারকে হত্যা করে। তাই তাদের অন্যায়কে মাথা পেতে নেয়নি দুলাল। বরং মুক্তিযুদ্ধে আশরাফের ভূমিকা প্রসঙ্গে সে অকুতোভয়ে বলে:

> তোরা স্বাধীনতার জন্য লড়িসনি, সেজন্য মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা কর্‌ছিস্ ! দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের তোরা নির্মূল করছিস্। কিন্তু এটা অসম্ভব। আমরা মরছি, আমরা বেঁচে থাকবো। (*অপর যোদ্ধারা*, পৃ. ৪১)

এ-পর্যায়ে দুলালকে আশরাফ গুলি করে মারেনি এ কথা সত্য কিন্তু অন্ধকার গুদামঘরে পেশাদার গুণ্ডাদল কর্তৃক ধোলাই করে রক্তাক্ত ও অজ্ঞান করে ফেলে। আর এদেরই হাত থেকে নগদ তিন লাখ টাকার বিনিময়ে দুলালের জীবনটা কিনে নেয় সহপাঠী কামরান। অবশেষে কামরানের সঙ্গে অন্ধকার জগতে সম্পৃক্ত হয় দুলাল। মদ আর নারীসঙ্গ নিয়ে মত্ত হয়ে ওঠে সে। একপর্যায়ে এ অসৎ পথ ছেড়ে স্ত্রী শ্রাবণী আর সন্তানদের নিয়ে সুস্থ জীবনে ফিরে গিয়েছিল দুলাল। কিন্তু তাকে সুস্থ থাকতে দেয়নি স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি। দুলালকে সপরিবারে হত্যা করে আশরাফ। উপন্যাসের অন্তিম পর্যায়ে চিরবিস্মৃতির জগতে হারিয়ে যায় বীর মুক্তিযোদ্ধা দুলাল। এতৎপ্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের বক্তব্য:

> হাজার হাজার অপর যোদ্ধারা ঝড়ের ছেঁড়া ঝরাপাতার মতো কোথায় হারিয়ে গেছে। তারাও কি এ রকম পরিণতিই লাভ করেছে? ... তাদের জন্য কোন স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করবো না। (*অপর যোদ্ধারা*, পৃ. ৪৬)

মুক্তিযুদ্ধকালে স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে দুলাল। দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি বহাল তবিয়তেই আছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা কীভাবে দেশদ্রোহী শক্তির কাছে পরাজয় বরণ করল – সে বাস্তবতাই উন্মোচিত করতে চেয়েছিলেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। এখানে দুলাল প্রতীকী চরিত্র মাত্র। সে হয়ে উঠেছে বঞ্চিত, নিপীড়িত হতোদ্যম অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধার প্রতিনিধি চরিত্র।

স্বাধীনতা-উত্তর কালের বিশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা, প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নভঙ্গ ও অস্তিত্বের সংকট আলাউদ্দিন আল আজাদকে এ-ধারার উপন্যাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত অবলম্বনে রচিত এই উপন্যাস শেখ রহমত আলীর দৃষ্টিকোণে বিন্যস্ত হয়েছে। আত্মকথনের ভঙ্গি পুরোপুরি অনুসৃত না হলেও শেখ রহমত আলীর প্রেক্ষণবিন্দু থেকেই এ উপন্যাসের ঘটনাংশ উন্মোচিত হয়েছে। উপন্যাসের ঘটনাংশ মূলত আনোয়ার আলি অর্থাৎ দুলালকেন্দ্রিক।

অপর যোদ্ধারা উপন্যাসে আলাউদ্দিন আল আজাদ ঘটনা-বিস্তারের প্রতি যতটুকু মনোযোগী ছিলেন, শিল্পরূপের প্রতি ঠিক ততটুকু মনোযোগী ছিলেন না। এ উপন্যাসে দুলাল চরিত্র ব্যতীত প্রতিটি চরিত্র খণ্ড ও বৈচিত্র্যহীন। দুলাল চরিত্রের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী দিনগুলোর বিশ্বস্ত চিত্রাঙ্কনে সক্ষম হয়েছেন। এ উপন্যাসের একমাত্র সফল চরিত্র দুলাল। তার আছে সাহস, ধৈর্য, প্রতিবাদী চেতনা এবং স্বদেশপ্রেম। অন্যায়ের কাছে কখনও সজ্ঞানে মাথা নত করেনি দুলাল। আশরাফ ও কামরান চরিত্রদ্বয় স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিরই প্রতিনিধিত্ব করেছে। ব্যাংক লুটের মত ঘৃণ্য কাজই নয়, মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করতেও তারা কুণ্ঠিতবোধ করেনি। গোলাম সরওয়ার, হাজি সাহেব, আওরঙ্গ, সিকান্দার, দোয়েল প্রভৃতি চরিত্র তেমন বিকশিত হয়ে ওঠেনি।

ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে চলিত গদ্যরীতির পাশাপাশি অনেক সময় ঘটনাকে বাস্তবানুগ করার জন্য আঞ্চলিক কথ্যরীতি অনুসরণ করেছেন ঔপন্যাসিক। যেমন:

> বাবরীচুল এক জবরদস্ত একচোখ কানা সবজিওয়ালা সকলের সঙ্গে পিছনের চাকার ধরে হাঁকল, মার ঠ্যালা হেইয়ো; সাবাস জোয়ান হেইয়ো। (*অপর যোদ্ধারা*, পৃ. ২০)

আলাউদ্দিন আল আজাদ *অপর যোদ্ধারা* উপন্যাসে গ্রাম ও শহরের প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী সময়ের জীবনচিত্র শিল্পরূপময় করে উপস্থাপন করেছেন। মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার আলির জীবন-সংগ্রাম ও সাহসিকতার ইতিবৃত্ত অঙ্কনের সূত্রে আলাউদ্দিন আল আজাদ এ উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের চালচিত্র পরিবেশন করেছেন, যা স্বাধীনতা-উত্তর উপন্যাসধারায় দুর্লক্ষ্য।

স্বাগতম ভালোবাসা

আলাউদ্দিন আল আজাদের *স্বাগতম ভালোবাসা*[১] (১৯৮৩) মূলত প্রেমবিষয়ক একটি উপন্যাস। নগরজীবনের পটভূমিকায় উত্তম পুরুষে বর্ণিত এ উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে শাহরিক মানুষের জটিল জীবনরূপ, ব্যক্তি মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, নাগরিক উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রেমের যন্ত্রণা ও প্রতিকূল পরিবেশের চাপে পিষ্ট মানুষের অসহায়তা, হতাশা, শূন্যতা, একাকিত্ব ও অন্তর্যন্ত্রণা। ঔপন্যাসিক প্রধানত প্রেমকে কেন্দ্র করেই চিত্রিত করেছেন ব্যক্তিমনের দ্বন্দ্বক্ষত রূপ-রূপান্তর।

স্বাগতম ভালোবাসা উপন্যাসের ঘটনাংশ উন্মোচিত হয়েছে উপন্যাসের দুই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র নওশিন আহমদ লোপা ও শওকত মাহমুদ গোরার প্রেমচেতনাকে অবলম্বন করে। একজন অবসরপ্রাপ্ত সচিবের কন্যা লোপা আহমদ। লোপার পরিবারে আছে মা তাহমিনা ও ছোট ভাই শুভ; তার অন্য তিনভাইবোন বিদেশে অবস্থানরত। উপন্যাসের সূচনা পর্যায়ে দেখা যায়–উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের এহসান আহমেদের কন্যা লোপা আত্মমগ্ন ও উদাসীন এক তরুণী। প্রতিবেশী সুলতান মাহমুদের কন্যা নোরা তারই বান্ধবী। সেই সূত্রে নোরার ভাই গোরার সঙ্গে লোপার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। নোরার বাড়িতে লোপার যাতায়াতের সূত্রে গোরা ও লোপার মধ্যে তৈরি হয় প্রেমের সম্পর্ক। এক সময় দেখা যায় গোরা বেড়ানোর নাম করে নির্জন এলাকায় নিয়ে লোপার চরিত্র হননে উদ্যত হয়। এতে করে মনোজগতে

[১]আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'স্বাগতম ভালোবাসা', *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ২০০১, গতিধারা, ঢাকা। বর্তমান গ্রন্থে 'স্বাগতম ভালবাসা' উপন্যাসের পাঠ এ সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে। 'সে আমার প্রেম' নামে এটি প্রথম প্রকাশিত হয় *সানন্দা* সাপ্তাহিকের ঈদসংখ্যায় (১৯৮৩)।

কষ্ট পায় লোপা। গোরা লোপাকে প্রচণ্ডভাবে ভালবাসে। কিন্তু সেই ঘটনার পর থেকে লোপা সবসময়ই নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে গোরার কাছ থেকে। এ সময় গোরা সম্পর্কে লোপার মনোজাগতিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এরকম –

> প্রতিবেশী, শিক্ষিত পরিবার, ভালো ছাত্র ঐশ্বর্যশালী এবং সর্বোপরি আমার সহপাঠিনী বান্ধবীর ভাই–গোরা ভাইকে আমি আমার একজন অকৃত্রিম বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী হিসেবেই গ্রহণ করেছিলাম, এবং তাকে ঘিরে আমার রহস্যময় আবেগেরও তো কমতি ছিলো না। কিন্তু সে জোর করে, অতিরিক্ত কিছু উপহার দিয়েছে। এর দায়িত্ব তার, যদিও হয়তো এটা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়,বরং হতে পারে, সাময়িক দুর্বলতা। আমার মনে হয়েছে, এই ঘটনার পর তার সঙ্গে আমার পক্ষে সম্পর্কচ্ছেদ করাই কর্তব্য। (*স্বাগতম ভালোবাসা*, পৃ. ৪৩৯)

এতৎসত্ত্বেও গোরাকে এড়িয়ে যেতে পারেনি লোপা। মহান একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে নোরা ও লোপা শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাপ্রদর্শন শেষে বাড়ি ফেরার পথে দেখা হয় গোরার। হঠাৎ নোরার চাইনিজ খাওয়ার প্রস্তাবের সূত্র ধরে একটি রেস্তোরাঁয় অবস্থান নেয় গোরা-লোপা-নোরা। অতঃপর রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে তারা গমন করে অচেনা এক নির্জন বাড়িতে। সেই বাড়িতেই এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। বাড়িতে লোপাকে রেখে নোরা বেরিয়ে যায়। সে সময়ে গোরাসহ সাতজন লোপাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। সেদিন আত্মরক্ষা করতে পারেনি লোপা। অজ্ঞান অবস্থায় তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে ডক্টর ইসমত জাহান ও ডক্টর আসাদ করিম। পরবর্তী সময়ে লোপা অনুভব করে সে অন্তঃসত্ত্বা। লোপার বাবার কলেজ-জীবনের বন্ধু বিলাত-ফেরত ডাক্তার জাফর লোপার মাতৃত্বের ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করে বাড়ির সবাইকে অবহিত করলেন। কিন্তু লোপার বাবা এহসান আহমদ মেয়ের এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা মেনে নিতে পারেননি। এই ঘটনার পর থেকে গোরাও অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অনুশোচনায় জর্জরিত। গোরার বাবা প্রবীণ অধ্যাপক সুলতান মাহমুদ বিনয়ের সঙ্গে লোপার বাবা-মায়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেন। কিন্তু সেই প্রস্তাব এহসান সাহেব প্রত্যাখ্যান করেন। ঠিক সেই সময়ে লোপার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এরকম:

> ... বিছানায় বালিশ আঁকড়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলাম। এ কি করল সে? এ কি করল? আমার হৃদয় ভরে বসন্তের মত ধীরে ধীরে জন্মাছিল অপূর্ব মঞ্জরী, ক্রমে পুঞ্জপুঞ্জ হয়ে উঠছিল– আমার সারা অস্তিত্ব অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করেছিল, স্বাগতম ভালবাসা। কিন্তু সে আমাকে ভালোবাসার সুযোগ দিলো না! (*স্বাগতম ভালোবাসা*, পৃ. ৪৫১)

এদিকে গোরা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় নোরা তার বান্ধবী লোপাকে মিনতি করে – একবার গোরাকে দেখবার জন্যে। এসময় গোরা তার অপকর্মের জন্য লোপার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। কিন্তু লোপার বাবা-মা বিদেশে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়। মা-বাবার সঙ্গে বিদেশ যেতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে লোপা। উপন্যাসের অন্তিমে লোপা হয়ে ওঠে আত্মপ্রত্যয়ী। সবকিছু ভুলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞায় সে দৃঢ়চিত্ত হয়ে ওঠে। তাঁর অন্তর্সত্তায় যে-প্রত্যয় গভীর আলোড়ন ওঠে তা উপন্যাসে উদ্ধৃত হয়েছে এভাবে:

> ... আমার ভিতরটা শীতল, পাষাণপ্রতিম: সেখানে নদী নেই, শস্যক্ষেত নেই, আছে কেবল একটি ধূসর পথরেখা। সেখানে বৃক্ষ আছে, অজস্র বৃক্ষ; কিন্তু নিষ্পত্র। জীর্ণশীর্ণ, হাজারো স্রোতের আঙুলের মতো ডাল পালাগুলো ঈষৎ হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। মনে মনে শিউরে উঠলাম এবং বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল, এই সমস্ত পুষ্পহীন পত্রহীন বৃক্ষেও ফাল্গুনের ছোঁয়া লাগবে – অফুরন্ত বসন্তের জোয়ারে ভরপুর সম্ভার নিয়ে এরা জাগবে একদিন। (*স্বাগতম ভালোবাসা*, পৃ. ৪৫৪)

উপর্যুক্ত বর্ণনাংশের মাধ্যমে আলাউদ্দিন আল আজাদ একজন নারীর অন্তর্গত প্রত্যয় কিংবা সদিচ্ছাকে প্রকৃতির সঙ্গে একাকার করে পরিবেশন করেছেন। একজন নারী প্রকৃতির উদারতার মধ্যে বাঁচার সন্ধান পায় এবং বিচিত্র প্রতিকূলতার মধ্যেও যে দৃঢ় জীবনভাবনায় স্থিত হবার প্রয়াস পায় তা এ উপন্যাসে লোপার মাধ্যমে প্রতীকী তাৎপর্যে উপস্থাপিত হয়েছে। স্পষ্টতই, *স্বাগতম ভালোবাসা* উপন্যাসে অন্তিম পর্যায়ের ঘটনা-যোজনায় আলাউদ্দিন আল আজাদ ছিলেন জীবনের ইতিবাচক পরিণামে আস্থাশীল। তাঁর এ ইতিবাচক আবেগের কারণে এ উপন্যাসের পরিণাম হয়ে উঠেছে আশাসঞ্চারী।

স্বাগতম ভালোবাসা উপন্যাসে চরিত্রের সংখ্যা স্বল্প। এহসান আহমদ, তাহমিনা, নোরা, গোরা, ফ্লোরা, আনোয়ারা, সুলতান মাহমুদ, ডক্টর জাফর, ডক্টর ইসমত, ডক্টর আসাদ করিম প্রমুখ উপন্যাসের ঘটনাংশের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কোনো চরিত্রই অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়নি। যেহেতু এ উপন্যাসের কাহিনি লোপার জীবনকথাকেন্দ্রিক, সেহেতু তাকে কেন্দ্র করে প্রত্যেকটি চরিত্র হয়েছে পল্লবিত।

নওশিন আহমদ লোপার চরিত্রাঙ্কনে ঔপন্যাসিকের দক্ষতা বিস্ময়কর। আধুনিক বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে লোপা চরিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক গোরা শুরু থেকে

শেষ পর্যন্ত সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও পরিশেষে তার পরিণাম হয়ে উঠেছে অস্বাভাবিক। নারী চরিত্র হিসেবে তাহমিনা, আনোয়ারা বিকশিত হয়ে ওঠেনি।

স্বাগতম ভালোবাসার ঘটনাবিন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ। উপন্যাসে ঘটনা-বিশ্লেষণে উত্তম পুরুষের ভূমিকা পালন করেছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসে প্রকরণ-পরিচর্যার বিন্যাসে লেখক ছিলেন অনেকাংশে উদাসীন।

এ উপন্যাসের পটভূমি প্রেম। তাই উপন্যাসে বেশ কিছু বর্ণনাংশে ফ্রয়েডীয় লিবিডোর প্রভাব পড়েছে। একটি দৃষ্টান্ত:

> সেদিন হোটেল সোনারগাঁওয়ে লাচ্ছি পান করতে করতে পরস্পর তাকিয়েছিলাম, এবং তখনো আমার চাউনিতে হ্রদের মতো শান্ত গভীরতা; কিন্তু পরে সংসদ ভবনের সামনে ক্রিসেন্ট লেকের দিকে যাওয়ার সময় একটা আচ্ছাদান দেখতে পেলাম ওর চেহারায়– একটা গাছের ছায়ায় গাড়ি থামিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল এবং কাছাকাছি কোথাও লোকজন দেখতে না পেয়ে আচমকা হেঁচকাটানে আমাকে বুকের কাছে নিয়েই আমার ঠোঁটে পাগলের মতো, ব্যাকুলভাবে, চুম্বন করল। (*স্বাগতম ভালোবাসা*, পৃ. ৪২২)

প্রেমপ্রসঙ্গ উপস্থাপনের সূত্রে ঔপন্যাসিক বৈষ্ণব কবিতা ব্যবহার করেছেন সফলতার সঙ্গে:

> জনম অবধি হাম রূপ নেহারেনু নয়ন না তিরপিত ভেল।(*স্বাগতম ভালোবাসা*, পৃ. ৪২৫)
> লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখলুঁ, তবু হিয়া জুড়ন না গেল। (*স্বাগতম ভালোবাসা*, পৃ. ৪২৫)

স্বাগতম ভালোবাসা উপন্যাসে লোপার নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব, হতাশা প্রভৃতি উপস্থাপনে আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রকৃতি-পরিচর্যা, মগ্নচেতনাপ্রবাহরীতির সাহায্য গ্রহণ করেছেন। আত্মকথনমূলক এই উপন্যাসে লোপার জীবনরূপ উপস্থাপনে উল্লেখযোগ্য যে-সব প্রকরণ পরির্চযা প্রযুক্ত হয়েছে তার দৃষ্টান্ত:

ক. প্রকৃতি পরিচর্যা:

> ওদিকে, গাছে গাছে পাতার গুচ্ছে অনেক পাখির কিচিরমিচির, কলকাকলি। আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে যাবে সবাই, ঘুমিয়ে পড়বে নিজ নিজ নীড়ে খড়কুটোর বিছানায়। কিন্তু আমি জানি। আমি জানি, আমার চোখে ঘুম আসবে না। নিশুতি রাত অবধি । বরং যখন সুদূরলোকে, তারায় ছাওয়া আকাশের দিকে তাকাবো, যখন অজানা রহস্যসমূহ উন্মোচিত হওয়ার বদলে, আরও ঘনীভূত হবে;

কিছুই বুঝবো না আমি, কেবল বোবার মতো, আচ্ছন্নের মতো একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকবো। (*স্বাগতম ভালোবাসা*, পৃ. ৪২৬)

খ. মগ্নচেতনাপ্রবাহ:

আমি কে, যেন মনে করতে পারছি না, তবু বেশ ভালো লাগছে আমার। আমি হয়তো সারারাতই দাঁড়িয়ে থাকবো আমার জানালার কাছে এইসব দৃশ্যমালা দেখতে দেখতে। আমি দাঁড়িয়ে থাকবো আমার অন্তরের সিঁড়িতে, যখন গুণগুণ করে গাইব সখি ভাবনা কাহারে বলে, যাতনা কাহারে বলে তখন একটা ছায়াপথের মাঝখান দিয়ে উড়ে চলেছি। ঝলমল করে জ্বলছে শুকতারা; দূরে, কিন্তু খুব বেশি দূরে নয়। তখন আমার মনে হবে তার স্বপ্নিল আলোছায়ার নিচে বিঠোভেনের নবম সিম্পনির মতো মঞ্জরিত হবে আমার সময় যাতে আমি জলের উচ্ছ্বাস তুলে সাঁতার কেটে যাবো অদূরে সাগর পাখিওড়া নতুন দ্বীপপুঞ্জ এবং লাল নীল বেলুনে গাঁথা ফেস্টুন উড়ছে যাতে লেখা স্বাগতম ভালোবাসা। আমি কি এখন স্বপ্ন দেখছি? না মরীচিকা কোনোটাই না। আমার নিরিবিলি জানালায় দাঁড়িয়ে আমি কেবল চেতনাস্রোতে বর্ণালী ভাসমান। (*স্বাগতম ভালোবাসা*, পৃ. ৪৫৪)

উপন্যাসে চরিত্রের আচার-আচরণ ও জীবনভাবনার সঙ্গে সম্পর্কিত করে উপমা-অলংকার ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক। যেমন:

১. বলা বাহুল্য, আমি গোরাভাইয়ের সামনে কাঠের পুতুলের মতোই দাঁড়িয়েছিলাম। (*স্বাগতম ভালোবাসা*, পৃ. ৪২৫)
২. আমি যেন মৃত, ওফেলিয়ার মতো একটা স্রোতস্বিনীর কুটিলস্রোতে ভেসে যাচ্ছি অনন্তের দিকে।(*স্বাগতম ভালোবাসা*, পৃ. ৪৩৮)
৩. আমি কিছু ভাবছি না; কিন্তু এই কয়দিনের স্মৃতি প্রবাহ অন্তরে বয়ে চলেছে কালোস্রোতের মতো। (*স্বাগতম ভালোবাসা*, পৃ. ৪৫০)
৪. আমার শরীরটা এখন পাখির পালকের মতো হালকা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সজীব নিবিড়তা। (*স্বাগতম ভালোবাসা*, পৃ. ৪৫১)

স্বাগতম ভালোবাসা উপন্যাসে আলাউদ্দিন আল আজাদ চলিত গদ্যরীতি ব্যবহার করেছেন। কখনো কখনো ঘটনাকে অর্থবহ ও স্পষ্ট করার প্রয়োজনে তিনি ব্যবহার করেছেন ইংরেজি সংলাপ।

আলাউদ্দিন আল আজাদ *স্বাগতম ভালোবাসা* উপন্যাসে একজন নারীর বেদনাময় জীবনস্বরূপের চিত্র শিল্পরূপময় করে উপস্থাপন করেছেন। ক্ষুদ্র পরিসরে এই উপন্যাসটিতে প্রেম-প্রত্যাশা, অচরিতার্থতা এবং তজ্জনিত শূন্যতা-হতাশা–সবকিছুই ইতিবাচক দৃষ্টিতে শিল্পান্তর্গত করে পরিবেশনায় তিনি যে সফল হয়েছেন তা নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করা যায়।

পুরানা পল্টন

আলাউদ্দিন আল আজাদের *পুরানা পল্টন*[১] (১৯৮৪) স্বাধীনতা উত্তরকালের নগরকেন্দ্রিক জটিলতা ও জীবনবোধের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। এটি রাজধানী ঢাকা শহরের প্রেক্ষাপটে রচিত। নগরকেন্দ্রিক উচ্চবিত্ত শ্রেণির উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন, মধ্যবিত্তের অর্থসংকট ও নব্য বুর্জোয়া শ্রেণির উত্থান-প্রসঙ্গ ব্যক্ত হয়েছে এ উপন্যাসে।

পুরানা পল্টন উপন্যাসের ঘটনাংশ উন্মোচিত হয়েছে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মাহতাব আলী সরকারের পারিবারিক জীবনকাহিনিকে উপলক্ষ করে। ঢাকার পুরানা পল্টনের বনেদি বাসিন্দা লেখক মাহতাব আলী সরকার। পাঁচ পুত্র-কন্যা ও স্ত্রী নূরজাহান বেগমকে ঘিরে তাঁর সংসার। লেখালেখি করলেও তেমন সুনাম অর্জন করতে পারেননি তিনি। তাঁর স্বপ্ন ছিল সন্তান-সন্ততিদের ঘিরে। কিন্তু তাঁর চিন্তাজগতের সঙ্গে সন্তানদের চিন্তাজগতের বেশ পার্থক্য রয়েছে। আধুনিক যুগে ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশাকে পছন্দ করতেন না মাহতাব। তাই নিয়ে স্ত্রী নূরজাহানের সঙ্গে প্রতিনিয়ত ঝগড়া ও অভিমান হতো তাঁর। তাঁর পুরাতন বাড়ি ভেঙে নতুন করে গড়ার স্বপ্ন দেখছিল ছেলেরা। কিন্তু নতুন বাড়ি নির্মাণে বাধা দিয়েছিলেন বলে বড়ো দুই ছেলে পিতৃগৃহ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। সর্বকনিষ্ঠ কন্যা তাহমিনা মাহতাব মোনাকে নিয়ে তিনি সবসময়ই থাকেন চিন্তাগ্রস্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রী মোনালিসা মোনা। একদিন বনভোজন শেষে জয়দেবপুর থেকে ফেরার পথে উত্তরার একটি নির্জন বাড়িতে মীর মনসুর আহমেদের পুত্র রানা আহমেদ ও তার চারজন বন্ধু কর্তৃক ধর্ষিত হয় মোনালিসা। এই দুঃসংবাদ মাহতাব আলী শুনতে পান তারই শিল্পীবন্ধু শাহতাবের ছেলে লিওর কাছে। সংবাদটি শুনেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন তিনি। অতঃপর ক্ষোভে, বিক্ষোভে নিজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান পত্রিকা অফিস ও

[১]আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'পুরানা পল্টন', *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০০, গতিধারা, ঢাকা। বর্তমান গ্রন্থে 'পুরানা পল্টন' উপন্যাসের পাঠ এ সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে। প্রথম প্রকাশ *রোববার* ঈদসংখ্যায় (১৯৮৪)।

প্রেসক্লাবের উদ্দেশে। মেয়ের এ অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনার প্রতিকার প্রার্থনা করেন তিনি। কিন্তু কেউ তাকে সহায়তাদানে এগিয়ে আসেনি। প্রতিকারের আশায় পরিশেষে রানার বাবার শরণাপন্ন হয়েও ব্যর্থ হন তিনি। রানার পক্ষেই অবস্থান নেন তার বাবা মনসুর। নব্য বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি মনসুরের মন-মানসিকতা প্রকাশ করেছেন ঔপন্যাসিক এভাবে:

> ... আমি চাই, আমার ছেলে অন্তত গুণ্ডা ও বদমাইশ হোক। অন্তত একটা ছেলে গুণ্ডা ও বদমাইশ না হলে এ-সমাজে বাঁচতে পারবে না, বড় হওয়া দূরের কথা। আর আমার এত কষ্টের প্রোপার্টিও রক্ষা করতে পারবে না। (*পুরানা পল্টন*, পৃ. ৭৫)

রানার অপকর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত হলেও মনসুর তাঁর ছেলের অসামাজিক কার্যকলাপকে স্বীকৃতি দেন অকুণ্ঠিতচিত্তে। এমনকি বন্ধু মাহতাবকে রিভলবার দেখিয়ে ভয়ও দেখান তিনি। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় মাহতাব মনসুরকে উদ্দেশ্য করে বলেন–

> ... আর বোলো না মনসুর আর কিছু বলো না। আমাকে গুলী করো তুমি, গুলী করো। (*পুরানা পল্টন*, পৃ. ৭৬)

মনসুরের ব্যবহারে আহত হয়ে মাহতাব শরণাপন্ন হন বন্ধু শাহতাবের। কিন্তু হঠাৎ করেই মাহতাব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একপর্যায়ে বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন :

> ...আমি আর বাঁচবো না; কারণ আমি বাঁচতে চাই না । আমার সমস্ত প্রাণশক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেছে। (*পুরানা পল্টন*, পৃ. ৭৯)

মোনার সমস্ত ঘটনা বন্ধু শাহতাবের কাছে অকপটে জ্ঞাপন করেন মাহতাব। পরিশেষে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি প্রত্যাবর্তন করেন তিনি। এসময় বাবার কাছে নিজের ব্যর্থতা ও হতাশার কথা ব্যক্ত করে মোনা। মোনার কথা শুনে মাহতাব মগ্নচৈতন্যে সমর্পিত হন। তাঁর মস্তিষ্ককোষে ভিড় করে অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দমালা–

> ... বেশ মা, তাই ভালো হবে। তোর আর বেঁচে থাকা উচিত নয়। তুই মরে যা-। কিন্তু কেমন করে? কেমন করে মরবি? গলায় ফাঁস দিয়ে মরিস না। চোখজোড়া বেরিয়ে আসবে, তা আমি দেখতে পারবো না। কষ্ট পাবো। পুকুরে ডুবিস না। লাশ ফুলবে, বিকৃত হয়ে যাবে। তা আমি দেখতে পারবো না। কষ্ট পাবো। গলায় ছুরি? তাও না। সে বিদঘুটে ভয়ংকর। ... তুই মরবি, সুন্দরভাবে। ... এই নে ঘুমের বড়ি। ... গেলাসে পানি নিয়ে সবগুলো খেয়ে ফেলবি, সবগুলো। (*পুরানা পল্টন*, পৃ. ৮১)

মাহতাব অবচেতন মনে প্রত্যক্ষ করেন মোনা, নূরজাহান, মাহফুজ, রানা সবাইকে তিনি রক্তাক্ত করছেন কোরবানির দা দিয়ে। শেষ পর্যন্ত কাহিনিটি দ্রুত নাটকীয়তায় মোড় নেয়। ঘুমের ঘোরে স্ট্রোক করেন মাহতাব। সকালবেলা মাহতাবের অজ্ঞানদশা দেখে গৃহপরিচারক মোবারক খবর দেয় নূরজাহানকে। চিকিৎসাশেষে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন মাহতাব। এদিকে মেয়ে মোনা বিমানের এয়ার হোস্টেস হিসেবে চাকরি পেয়েছে শুনে বেশ আনন্দিত বোধ করেন মাহতাব। অতঃপর:

> মেয়ের একটি হাত টেনে নিলেন মাহতাব সরকার, তারপর ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে ওকে দেখতে থাকেন। চোখের ভিতর থেকে বড়-বড় গরম অশ্রু বেরিয়ে এল, আস্তে আস্তে গড়িয়ে পড়ে। বাবার গায়ের চাদরটা ঠিক করে দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে যাওয়ার আগে মোনা বলল, ছিঃ অমন করো না। আমি আবার আসবো। এখন ঘুমিয়ে পড় তো। (*পুরানা পল্টন*, পৃ. ৯১)

স্পষ্টতই, *পুরানা পল্টন* উপন্যাসে মাহতাব আলী সরকারের জীবন-সংগ্রাম চিত্রাঙ্কনে আলাউদ্দিন আল আজাদ ছিলেন বাস্তবতা-সচেতন। তাঁর এ উপন্যাসে সমাজজীবনে বিরাজিত স্খলন-পতন-অধঃপতন, মধ্যবিত্তের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম ও সংকট শিল্পরূপময় হয়ে উঠেছে।

পুরানা পল্টন উপন্যাসে চরিত্রের সংখ্যা স্বল্প। ঘটনার প্রয়োজনেই চরিত্রসমূহ ব্যবহার করেছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। মাহতাব আলী সরকারের চরিত্রাঙ্কনে ঔপন্যাসিক প্রাজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিভূ মাহতাব পরিবারের প্রতি ছিলেন দায়বদ্ধ। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার আচরণে তিনি ছিলেন অতৃপ্ত। এ চরিত্রটি নাগরিক জীবনের বাস্তবানুগ প্রেক্ষাপটে সৃষ্টি করেছেন ঔপন্যাসিক। নূরজাহান, মোনা, মাহফুজ, শাহাবুদ্দিন আফতাব, মোবারক প্রমুখ চরিত্র ঘটনার প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক।এর মধ্যে মোনা চরিত্রের মধ্য দিয়ে উচ্ছন্ন জীবন ও সুস্থ জীবন–এ দুধারার চিত্রাঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক। উচ্চবিত্ত শ্রেণির উচ্ছৃঙ্খলতা ও বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে মীর মনসুর আহমদ ও রানা আহমদের চরিত্র হয়ে উঠেছে বাস্তবানুগ।

সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ অবলম্বনে রচিত এ উপন্যাসটি প্রধানত বিবরণধর্মী হলেও কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার বর্ণনা হয়ে উঠেছে চিত্রময় ও গীতময়। মাহতাব আলী সরকারের ভাবময় দৃষ্টিকোণে নির্মিত এরকম একটি এলাকা লক্ষণীয়:

> সত্যই মোনা এসেছিল, তখন খুব সম্ভব রাত বারোটা বাজে, আর এখন? আবার দূরে ঢং ঢং আওয়াজ, দুটো বাজল। দুই ঘণ্টার ব্যবধান। জানালায় ঝিরঝিরে হাওয়া, গাছের ডালপালা পাতার আচ্ছাদন ভেদ করে মায়াবী জ্যোৎস্নার লুকোচুরি, রাস্তার মাটির উপরে। পুরোপুরি নিঝ্‌ঝুম বাসাটা এখন, সারা পুরানা পল্টনই নিঝ্‌ঝুম। দূরের কুকুরটাও ডাকছে না। স্রোতের পর স্রোত নীরবতা নেমে আসে অদৃশ্য অতল প্রবাহের মত; বালিশটা কখন খাটের কানিশ থেকে নামিয়েছিলেন জানেন না, কাঁচাপাকা চুলভর্তি মাথাটা এলিয়ে পড়ল। (*পুরানা পল্টন*, পৃ. ৮২)

পুরানা পল্টন উপন্যাসে বিষয় ও চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে সাবলীল ও প্রাঞ্জলভাবে উপমাসমূহ নির্মাণ করেছেন ঔপন্যাসিক। যেমন:

১. তুই সুন্দর, বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি, একটা অনবদ্য কবিতার মতো। (*পুরানা পল্টন*, পৃ. ৮১)
২. তাড়া করে চলেছেন আঁকাবাঁকা গলিপথে বাসাবাড়ির পাশ দিয়ে, গাছের নিচ দিয়ে। রক্তপিপাসু ক্ষিপ্ত পিশাচের মতো। (*পুরানা পল্টন*, পৃ. ৮৫)
৩. ...বাজ পাখির মতো একঝাঁক জেট ফাইটার বিমান, এদিকে এসেই চলন্ত গাড়ির উপর ছোঁ মারতে লাগল। (*পুরানা পল্টন*, পৃ. ৮৮)

পুরানা পল্টন উপন্যাসের ভাষাভঙ্গি সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। চলিত গদ্যের অসামান্য ব্যবহারে বিষয় ও চরিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে সপ্রাণ আবহ।

জীবন-বাস্তবতা রূপায়ণের পরীক্ষায় আলাউদ্দিন আল আজাদ *পুরানা পল্টন* উপন্যাসে যে সার্থকতা সম্পাদনে সক্ষম হয়েছেন তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। স্বল্প-পরিধির এ উপন্যাসে আখ্যান, চরিত্র, দৃষ্টিকোণ, ভাষা ও শৈলী নির্মাণে তিনি যথার্থই সার্থক।

জ্যোৎস্নার অজানা জীবন

আলাউদ্দিন আল আজাদের *জ্যোৎস্নার অজানা জীবন*[১](১৯৮৪) উপন্যাসটি ফ্রয়েডীয় লিবিডো চেতনাশ্রিত একটি উপন্যাস। আত্মকথন প্রক্রিয়ায় সর্বমোট ৮টি পরিচ্ছেদে এ-

[১]আলাউদ্দিন আল আজাদ, '*জ্যোৎস্নার অজানা জীবন*', *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, গতিধারা, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০০, ঢাকা।
বর্তমান গ্রন্থে 'জ্যোৎস্নার অজানা জীবন' উপন্যাস এ সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় *সচিত্র সন্ধানী*

উপন্যাসে ডাক্তার মমতাজ জাহান বেগমের (জ্যোৎস্না) যন্ত্রণাদগ্ধ মানসরূপের উন্মোচন ঘটিয়েছেন ঔপন্যাসিক। এ উপন্যাসে মধ্যবিত্তশ্রেণির জীবনসংগ্রাম, কামজপ্রেম, মনোবিকলন, নিঃসঙ্গতা, অন্তস্তলের যন্ত্রণা প্রভৃতি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে শিল্পরূপ দিয়েছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। জ্যোৎস্নার আত্মকথন ও আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনকথা উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসের শুরুতেই দেখি ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত একটি দ্বীপের উদ্দেশে ডাক্তার জ্যোৎস্না তাঁর শৈশবকালীন বান্ধবী সালমা কবির, ডাক্তার হোসনে আরা ও রেডক্রস থেকে আগত একটি দল চিকিৎসা ও সেবার উদ্দেশ্যে জাহাজযোগে যাত্রা করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে জ্যোৎস্নার অতীত ও বর্তমান জীবনস্বরূপকে অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি দিয়ে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ।

এ উপন্যাসে জ্যোৎস্নার অতীত জীবন-কথা যেমন চিত্রিত হয়েছে, ঠিক তেমনি উপস্থাপিত হয়েছে জ্যোৎস্নার পিতা গণিত শিক্ষক আবুল হাশিমের জীবনসংগ্রাম, মা উলফত বানুর অবৈধ প্রণয়কথা, প্রবীণ ডাক্তার জাফরের বিকৃত মনোবৃত্তি ও যুক্তিবিদ্যার শিক্ষক ফেরদৌস আরার বিকৃত চিত্তবৃত্তির স্বরূপ।

মধ্যবিত্ত পরিবারের আবুল হাশিমের জ্যেষ্ঠ সন্তান জ্যোৎস্না। বিজ্ঞানের ছাত্রী ছিল সে। দেশবিভাগের সূত্রে সহকর্মী দীননাথ ভট্টাচার্যের বাড়ি ক্রয় করেন গণিত শিক্ষক আবুল হাশিম। অতঃপর স্ত্রী উলফত বানু ও সন্তান-সন্ততিকে নিয়ে শহরে বসবাস শুরু করেন তিনি। ছেলে-মেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন –এই ছিল তাঁর অন্তর্গত আকাঙ্ক্ষা। একপর্যায়ে আবুল হাশিম পেপটিক আলসারে আক্রান্ত হন। হঠাৎ একদিন রক্তবমি শুরু করেন তিনি। সেদিন বর্ষণমুখর রাত্রে বাবার এই দৃশ্য দেখে জ্যোৎস্না শরণাপন্ন হয় ডাক্তার জাফরের কাছে। কিন্তু জ্যোৎস্নার আর্থিক সংকট ও অসহায়ত্ব পুঁজি করে ডাক্তার জাফর জোরপূর্বক শরীরী সম্পর্ক স্থাপন করে তার সঙ্গে। এতৎপ্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের বর্ণনাংশ লক্ষণীয়:

> তখনো বাতাস ও বৃষ্টির অবিরাম শব্দ। জ্যোৎস্না প্রতিরোধের সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। চোখ বুঁজে আছে। সে অনুভব করল, তার উপরে পাথরের মত একটা জীবন্ত পদার্থ চেপে বসেছে। তার বুকে ঠোঁটে মুখে ক্রমে সমস্ত দেহে উন্মত্ত আন্দোলন। একসময় মনে হয় দুই জানুর ফাঁকে তলপেটের মাঝখানটা ছিঁড়ে গেল। সে কাতরে উঠল। তখন কালবৈশাখী তুফানটা যেন একটা

ঈদসংখ্যায় (১৯৮৪)।

> প্রবল চাপে ঘরের ভিতরে ঢুকে ওকে ঘিরে ভীষণ খেলায় মেতে উঠেছে।(*জ্যোৎস্নার অজানা জীবন,*পৃ. ১০২-১০৩)

কিন্তু অসুস্থ পিতার কথা ভেবে ডাক্তার জাফরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেনি জ্যোৎস্না; বরং নিয়তিকে মেনে নিয়ে ডাক্তার জাফরকে নিয়ে সে নিজের বাড়িতে আসে। একপর্যায়ে এ অস্বাভাবিক দেহমিলনের ঘটনা বান্ধবী সালমার কাছে প্রকাশ করে সে। চিকিৎসার একপর্যায়ে তার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর এতটুকু মনোবল হারায়নি জ্যোৎস্না। স্কুলজীবনের ঐ বলাৎকারের ঘটনাকে তুচ্ছ করে দেখেছে সে; শিক্ষিত মানুষের আচরণকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিবেচনা করেছে। কিন্তু পুরুষ মানুষের প্রতি তার মনে জন্মেছে প্রবল অবিশ্বাস ও অরুচি। জাহাজযোগে ঘূর্ণিঝড়-বিধ্বস্ত দ্বীপে যাত্রাকালে বান্ধবী সালমা কবির ডাক্তার জাফরের প্রসঙ্গ তুললে জ্যোৎস্নার প্রতিক্রিয়া ছিল এরূপ:

> অতীতটা আমার কাছে ভস্মস্তূপ মাত্র। অতীতে কত কিছুই ঘটেছে, সেসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। একমাত্র মেয়ে হয়ে জন্মেছিলাম বলেই, যদিও সর্বদাই আমি নৃশংস নিষ্ঠুর বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছি তবু আজকে পেছন ফিরে তাকালে কোনো দুঃখ হয় না, আফসোস হয় না। জীবনটাকে ওভাবে না জানলে আজকের আমি এরকম আমি হতে পারতাম না। আমি বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে সব বিশ্লেষণ করতে শিখেছি, সেজন্য মনে হয় আমরা যাকে বলি অশ্লীল ও বিকৃত, তাও প্রবহমান জীবনেরই একরকম সত্য। (*জ্যোৎস্নার অজানা জীবন,*পৃ. ১০৫)

কঠিন জীবনসংগ্রামের মধ্যেও জ্যোৎস্না তাই ভেঙে পড়েনি, বরং সবকিছুকে ভুলে বহ্নিশিখার ন্যায় জ্বলে উঠেছে সে। অর্থের অভাবে পিতার মৃত্যু, মা উলফত বানুর সঙ্গে ডাক্তার জাফরের অবৈধ যৌনসম্পর্ক—সবকিছুই নিজের নিয়তি বলে মেনে নিয়েছে সে। শিক্ষাজীবন নির্বিঘ্ন করবার জন্য মাকে আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে বিয়ে ভেঙে দিয়েছে জ্যোৎস্না। সে ডাক্তার হতে চেয়েছিল; চেয়েছিল সার্জন হতে। কিন্তু বন্ধুমহলে অসাধারণ সুন্দরী বলে প্রতিনিয়ত নানা প্রতিকূল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাকে। এমনকি মেডিকেলে পড়ার সময়ে প্রফেসর গুঞ্জর আলি জ্যোৎস্নার চরিত্র হনন করতে চেয়েছিল। আলাউদ্দিন আল আজাদ ইউরোপীয় মূল্যবোধ ও জীবনবিন্যাসের সঙ্গে সমীকৃত করে জ্যোৎস্নার জীবনকে অঙ্কন করেছেন এ উপন্যাসে।জ্যোৎস্না তার স্বপ্নাকাঙ্ক্ষাকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করেছে এভাবে:

> ... আমার কঠিন সংকল্প, আমি একজন ডাক্তার হবো। আমি মানুষের বডি ডিসেকশন করবো। তার ফুসফুস কাটবো, হৃৎপিণ্ড কাটবো। আমি দেখবো, হ্যাঁ আমি দেখতে চাই—মানুষে কতটুকু আদিম পশু। (*জ্যোৎস্নার অজানা জীবন*,পৃ. ১০৭)

বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে পিতার চিকিৎসাকে কেন্দ্র করে জোরপূর্বক ডাক্তার জাফর তার সতীত্ব হরণ করে। কিন্তু একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পর সে দেখে—ডাক্তার জাফরের সঙ্গে মা উলফুত বানুর অবৈধ যৌনাচারের দৃশ্য। এই দৃশ্য জ্যোৎস্নার মনোদৈহিক চেতনাস্তরে নিদারুণ অভিঘাত তোলে, যা ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন এভাবে:

> একটা অলৌকিক নেশায় যেন পেয়ে বসেছে, জ্যোৎস্না দৃষ্টি মেলেছিল, ক্রমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে এলে, এখানেই তোষকে পাতা বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ এমনি শুয়ে থাকে, এবং কান পেতে শোনে ধ্বনিপ্রতিধ্বনি এবং কাঠের চৌকির মচর্‌মচর মৃদু আওয়াজটা অব্যাহত থাকতেই সে হঠাৎ সটান উঠে দাঁড়ায় এবং মৃদু পায়ে চৌকি থেকে নেমে দরোজায় কপাট নিঃশব্দে ভেজিয়ে রেখে বাইরে চলে এল। (*জ্যোৎস্নার অজানা জীবন*,পৃ. ১২৯)

মা উলফুত বানুর সঙ্গে ডা. জাফরের যৌনক্রিয়া দর্শনে লিবিডোর যে টান অনুভব করে জ্যোৎস্না, সে-টানে সে ছুটে যায় বাল্যবন্ধু আহসানের কাছে। কিন্তু জ্যোৎস্নার কামজ বাসনাকে গুরুত্ব দেয়নি আহসান। ক্ষুব্ধচিত্তে তাই আহসানকে চড় মেরে বসে জ্যোৎস্না। অতঃপর দ্বিধাদ্বন্দ্বময় জীবনস্রোতে নিক্ষিপ্ত হয় সে। যুদ্ধকেই সে নিয়তি হিসেবে গ্রহণ করে। চর দিঘলদিতে গড়ে তোলে গ্রামীণ সেবাপ্রকল্প।

জ্যোৎস্নার অজানা জীবন উপন্যাসে আলাউদ্দিন আল আজাদ একজন সংগ্রামী নারীর জীবনসংগ্রাম, তাঁর স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা, নিঃসঙ্গতা, অন্তর্যন্ত্রণা ও লিবিডোচেতনা শিল্পসফলভাবে উপস্থাপন করেছেন। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রও জ্যোৎস্না। তাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র আবর্তিত হয়েছে। জ্যোৎস্না ছাড়া প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্র খণ্ড, অপূর্ণ। এ উপন্যাসে জ্যোৎস্না চরিত্রটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন ঔপন্যাসিক। জীবনসংগ্রামে সে উজ্জ্বল, দীপ্তিময়। সালমা কবিরের সংগ্রামমুখী জীবনচেতনা তাকে দিয়েছে স্বতন্ত্রমাত্রা। মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে আবুল হাশিম চরিত্রটিও সার্থক।

জ্যোৎস্নার অজানা জীবন উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাসে ও চরিত্রসৃজনে আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রধানত ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ। এই উপন্যাসের ঘটনা উত্তমপুরুষে বর্ণিত। 'এ-ধারার উপন্যাসে কখনো লেখক স্বয়ং কাহিনীকথকের ভূমিকা পালন করেন, আবার কখনো নির্বাচিত চরিত্রের মাধ্যমে কাহিনী বর্ণনা করেন। ঔপন্যাসিক শিল্পরূপের এই বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে একজন জর্মন সমালোচকের মন্তব্য প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য:

> The function of memory in the first person narrative far exceeds the ability to visualize and vividly present that which is past. Remembering itself is a quasi-verbal process of silent narration by which the story receives an aesthetic form, primarily as result of the selection and structuring inherent in recollection.'[১]

বলা যায়, জ্যোৎস্নার অজানা জীবন একটি স্মৃতিচারণমূলক উপন্যাস। নিঃসঙ্গ ও কামনাতাড়িত জ্যোৎস্নার দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হওয়ায় এ উপন্যাসের বর্ণনা প্রায়ই হয়ে উঠেছে স্বপ্নময় ও গীতময়। যেমন:

> ... আমি কি চাই নিজেই জানি না। তবে যে-কোন একটা পুরুষের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে প্রতি দেড়বছরে একটি করে সন্তান প্রসব—এ আমার কাম্য নয়। আমি একটা স্বপ্ন দেখি। যেন সুদৃঢ় আদিম চৈতন্য লোকের একটি দৃশ্য। আমি স্বপ্নে দেখি একজন পুরুষের, যে বলিষ্ঠ ও গম্ভীর। প্রায় দেবতার মতো; কিন্তু দেবতা নয়। তাকে পেলে আমি আমার চরিত্র বিসর্জন করবো। আমার গর্ভে আমি তার একটি সন্তান ধারণ করতে চাই– যে একদিন ভূমিষ্ট হবে এবং বড় হয়ে পৃথিবীর চেহারাটাকে পাল্টে দেয়ার জন্য অভিযানে বেরুবে। যেমন বেরিয়েছিল হারকিউলিস। (*জ্যোৎস্নার অজানা জীবন*,পৃ. ১১৩)

এ উপন্যাসে আলাউদ্দিন আল আজাদ জ্যোৎস্নার দৃষ্টিকোণ থেকে উলফত বানু-জাফরের রোমান্টিক হৃদয়াবেগ, প্রেম-প্রণয় ও লিবিডো সম্পর্ককে প্রতীকী-চিত্রকল্পে রূপময় করে তুলেছেন। যেমন:

> ... চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন চারদিক থেকে যেন একটা নিবিড় অন্ধকার নেমে আসছে। সে দেখেছে, একটা পুরুষের স্বাস্থ্যবান সুঠাম শরীর তাতে যেন একটা বলিষ্ঠ ষাঁড়ের শক্তি পটপট করছে। তার নাভির নীচে, তলপেট ছাড়িয়ে দুই উরুর মাঝখান থেকে একটা মারাত্মক গোখরা সাপ, যেন ফণা তুলে আছে। এখন প্রস্তুত পূর্ণোত্থিত বেপরোয়া। এই প্রথম দেখছে। নিজের সমস্ত শরীরে একটা

[১] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

প্রবল ঝাঁকুনি জেগে উঠল। এবং এক রকম পিচ্ছিল জলীয় পদার্থ গতর বেয়ে, গতরের ভিতর থেকে নামছে, নিচে নামছে। থেমে থেমে সে দেখছে সেই আষাঢ়ের রাতে তো কিছু দেখিনি; কেবল যন্ত্রণা পেয়েছিল। (*জ্যোৎস্নার অজানা জীবন*, পৃ. ১২৯)

জ্যোৎস্নার অজানা জীবন উপন্যাসে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনাংশ বর্ণিত হয়েছে জাহাজে ভ্রমণরত জ্যোৎস্নার স্মৃতিময় অনুষঙ্গে। কখনও কখনও প্রকৃতির বাস্তব দৃশ্যচিত্র জ্যোৎস্নার দৃষ্টিকোণে হয়ে উঠেছে বাঙ্ময় ও জীবন্ত। যেমন:

১. আদিগন্ত থইথই বঙ্গোপসাগর, বিশাল জলরাশির বুক কেটে আমাদের মাঝারি আকারের জাহাজটা যখন এগিয়ে চলেছে তখন তা সকালবেলায় সূর্যোলোকে ঝিক্‌মিক্ করছে। দুই পাশ দিয়ে উচ্ছ্বসিত ফেনিলতা। পিছনে একঝাঁক সাগর-পাখি আমাদের অনুসরণ করে উড়ে আসছিল পাখা ঝাপটিয়ে, এখন তাদের দেখা যাচ্ছে না। (*জ্যোৎস্নার অজানা জীবন*, পৃ. ৯৫)

২. আমি থ মেরে তাকিয়ে ছিলাম। শেষ কথাটার আমি কিছু বুঝলাম না, আমাদের সামনে তখন আচ্ছন্ন আকাশের নিচে বিপুল বিশাল অনন্ত সমুদ্র থইথই করছে, সর্‌সর্ শব্দে পারের উপরে গিয়ে ফেনিল উচ্ছ্বাসে ভেঙে ভেঙে পড়ছে। (*জ্যোৎস্নার অজানা জীবন*, পৃ. ১৩৪)

জ্যোৎস্নার অজানা জীবন উপন্যাসে বিধৃত উপমা-অলংকার উপন্যাস-বর্ণিত চরিত্রের চিন্তা-চেতনা, নিঃসঙ্গতা-শূন্যতা, ভাবনা-প্রত্যাশার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে সাবলীলভাবে নির্মাণ করেছেন ঔপন্যাসিক। কয়েকটি উপমা বর্তমান প্রসঙ্গে লক্ষণীয়:

১. চৈত্রের মাঝামাঝি, সে রাতে কালির মতো কালোমেঘে আকাশ ছেয়ে ঘনিয়ে এসেছিল দুর্যোগ। (*জ্যোৎস্নার অজানা জীবন*, পৃ. ৯৮)
২. ছোট ছোট মার্বেলের মতো চোখে পিট্‌পিট্ করে তাকান। (*জ্যোৎস্নার অজানা জীবন*, পৃ. ১০১)
৩. যেন পাগল হয়ে যাচ্ছি, আমি উলঙ্গ হলাম; তারপর প্রেতাত্মার মতো ঘরময় ছুটোছুটি করতে লাগলাম। (*জ্যোৎস্নার অজানা জীবন*, পৃ. ১২৩)
৪. জ্যোৎস্নার মুখেও একটা স্নিগ্ধতা, রজনীগন্ধার মত। (*জ্যোৎস্নার অজানা জীবন*, পৃ. ১২৫)
৫. পূর্বদিকে সোনার থালার মত পূর্ণিমার চাঁদ। (*জ্যোৎস্নার অজানা জীবন*, পৃ. ১২৬)
৬. এদিকে বেড়ার এপাশে জ্যোৎস্নার শরীরে তড়িৎ প্রবাহের মতো শিহরণ খেলে যাচ্ছে, মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করতে লাগল। (*জ্যোৎস্নার অজানা জীবন*, পৃ. ১২৯)
৭. সব পরিকল্পনা ঝুর্‌ঝুর্ করে পুরাতন প্রাচীরের মতো ভেঙে পড়ত। (*জ্যোৎস্নার অজানা জীবন*, পৃ. ১৩১)
৮. আলতোভাবে হাঁটুর কাছাকাছি ধরে নিচে সায়াসমেত শাড়ির প্রান্ত তুলে জ্যোৎস্না হাঁটছে চকিতাহরিণীর মতো শরীরে চাপা উচ্ছলতা, চোখের চাউনিতে চাঞ্চল্য। (*জ্যোৎস্নার অজানা জীবন*, পৃ. ১৩০)

উপন্যাসে ঘটনা চরিত্র ও পরিপ্রেক্ষিতকে সুস্পষ্ট করার প্রয়োজনে বেশকিছু ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক। সেগুলো হচ্ছে: গাইনোকোলজী ও মিডওয়াইকারীর, সুপেরিয়র অফিসার, ম্যাটারনিটি ওয়ার্ড, সিজারিয়ান অপারেশন, প্ল্যানসেট, বডি ডিসেকশন, অডিটর, এমবিশন, পারভারটেড প্রভৃতি।

জ্যোৎস্নার অজানা জীবন উপন্যাসে মূলত জ্যোৎস্নার সংগ্রামশীল জীবনচিত্রাঙ্কন আলাউদ্দিন আল আজাদের অন্বিষ্ট হলেও ঔপন্যাসিক চরিত্রপাত্রের বিকৃত মনোবিকার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির রূপ-রূপান্তরের চিত্রাঙ্কনে হয়ে উঠেছেন মনোযোগী ও উৎসাহী। শাহরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনচিত্রাঙ্কনে তিনি যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তা অসামান্য। জ্যোৎস্নার বেঁচে থাকার সংগ্রাম ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা উপস্থাপনায় আলাউদ্দিন আল আজাদ এ উপন্যাসে বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। নারীত্বের মর্যাদাকে তিনি মহিমান্বিত করে দেখেছেন।

যেখানে দাঁড়িয়ে আছি

আলাউদ্দিন আল আজাদের *যেখানে দাঁড়িয়ে আছি*[১] (১৯৮৪) মূলত প্রেম ও মনস্তত্ত্বধর্মী উপন্যাস। নগর জীবনের পটভূমিকায় উত্তমপুরুষে বর্ণিত এ উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে আধুনিক নর-নারীর দাম্পত্যজীবনের বিচিত্র জটিলতা, মনোজাগতিক অভীপ্সা, আত্মজিজ্ঞাসা ও সিদ্ধান্তহীনতা, উচ্চজীবনবোধের আকাঙ্ক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনপ্রক্রিয়া প্রভৃতি। এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের কিছু চিত্র। এই উপন্যাসে চম্পার অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের বিচিত্র ঘটনার সূত্র ধরে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।

যেখানে দাঁড়িয়ে আছি উপন্যাসে আলাউদ্দিন আল আজাদ ব্যক্তির প্রেমাকাঙ্ক্ষা ও তার পরিণতির সূত্র উন্মোচন করেছেন। নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের রূপ-রূপান্তর ও নর-নারীর মনোজাগতিক জটিলতার স্বরূপ সন্ধান করতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক। অর্থনৈতিক টানা-

[১]আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'যেখানে দাঁড়িয়ে আছি', *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, প্রথম প্রকাশ ২০০০, গতিধারা, ঢাকা। বর্তমান গ্রন্থে 'যেখানে দাঁড়িয়ে আছি' উপন্যাসের পাঠ এ সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় *স্বদেশ* ঈদুল আযহা সংখ্যায় (১৯৮৪)।

পড়েনে ব্যক্তির মূল্যবোধ কীভাবে রূপান্তরিত ও বিপর্যস্ত হয়, সে চিত্রও ব্যক্ত হয়েছে এই উপন্যাসে।

যেখানে দাঁড়িয়ে আছি উপন্যাসের ঘটনাংশ উন্মোচিত হয়েছে দুটি প্রণয়সম্পর্ক ও তার পরিণামের ঘটনাকে উপলক্ষ করে। মঞ্জুর হাসান ও রাশেদা হাসানের দাম্পত্যজীবনের টানাপড়েনে চম্পা-শাহনুরের প্রেম অনিশ্চয়তার পথে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। বিখ্যাত চিত্রপরিবেশক ও প্রযোজক মঞ্জুর হাসান ও জনপ্রিয় লেখিকা রাশেদা হাসানের বড় মেয়ে চম্পা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্রী। ভাইয়ের বন্ধু ভাস্কর্য-শিল্পী শাহনুরের সঙ্গে তার প্রণয়সম্পর্ক। ঘটনাক্রমে বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রবাসী আব্দুল মাজেদের একমাত্র ছেলে মাশুকের সঙ্গে চম্পার বিয়ে ঠিক হয়। মা বাবাও অসম্মতি দেননি। কিন্তু চম্পা গভীরভাবে ভালোবাসে শাহনুরকে। তাছাড়া চম্পার মা-বাবাও প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে মঞ্জুর হাসান ও রাশেদা হাসান দাম্পত্যজীবনে অসুখী। অর্থনৈতিক টানাপড়েনে মঞ্জুর হাসানের মনোজগত বদলে গেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আর্মির গুপ্তচরের কাজে নিয়োজিত ছিলেন তিনি। অতঃপর রাশেদার বান্ধবী হুমায়রার আর্থিক সহযোগিতা আর রাশেদার উৎসাহে ব্যবসা-বাণিজ্যের শিখরে পৌঁছে যায় মঞ্জুর হাসান। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বনানীর অভিজাত পরিবেশে বসবাস শুরু করলেও অনৈতিক জীবনযাপনের কারণে এ-দম্পতি উপনীত হয় গভীর সংকটে। স্বার্থোদ্ধারের জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে নিজের স্ত্রীকে সঁপে দেন মঞ্জুর হাসান। এমনকি নিজেও হোটেল পূর্বাণীতে চিত্র নায়িকা মর্জিনার সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কে লিপ্ত হন। মঞ্জুরের সামগ্রিক অপদশা প্রত্যক্ষ করে স্ত্রী রাশেদা একটি পর্যায়ে প্রতিবাদী সত্তায় আত্মপ্রকাশ করেন। একপর্যায়ে তিনি বলেন:

> তুমি পেয়েছ কি মঞ্জুর? সারা জীবন তো ঘাড়ে চেপে আছ, আবার এখনো আমাকে ব্যবহার করবে? আমি তোমার ঘুষের মাল ? (*যেখানে দাঁড়িয়ে আছি*, পৃ. ১৬২)

এ পরিস্থিতিতে রাশেদা হাসানও বেছে নেন লাগামহীন জীবন। তিনিও সখ্য গড়ে তোলেন শিল্পী শাহেদের সঙ্গে। মঞ্জুর-রাশেদা একসঙ্গে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করলেও দুজনেই লিপ্ত হন পরকীয়া প্রেমে। এমতাবস্থায় কন্যা চম্পার আত্মঅনুভবের একটি দৃষ্টান্ত:

> এই মুহূর্তে, আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমার বাবা-মার ক্রোধ সাময়িক; এখনো সম্ভবত এক বিছানায় শুয়ে আছেন। আমার বাবা মর্জিনার কাছে যাবেন, আমার মা যাবেন শাহেদের কাছে।

> আবার সকাল বেলায় একসঙ্গে বসে খানাপিনাও করবেন। মর্জিনা চলে গেলে আরেকজন, শাহেদ চলে গেলে আরেকজন। (*যেখানে দাঁড়িয়ে আছি*, পৃ. ১৭১)

পিতা-মাতার দায়িত্বজ্ঞানহীন দাম্পত্যজীবনের সংকট প্রভাবিত করে চম্পাকে। প্রেম সম্পর্কে তার মধ্যে জন্ম নেয় নেতিবাচক ধারণা। মিলন নয়, বিরহ-বিচ্ছেদের মধ্যেই সে আবিষ্কার করে প্রকৃত প্রেম:

> আমি বুঝেছি, বিবাহে প্রেমের মৃত্যু ঘটে। ... আমার অভিজ্ঞতা একেকটি স্তম্ভের মতো, পর পর গাঁথা হয়ে আছে আমার সমগ্র চেতনায়। বিবাহ দৈহিক মিলন, আসল লক্ষ্য সন্তান উৎপাদন; সেই সঙ্গে আত্মিক মিলনও জড়িয়ে থাকে, কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তোবা, কিন্তু সে কিছুকাল। দৈহিক মিলনের স্থূলতার তরঙ্গে সে ক্রমে ডুবে যায়, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় প্রাত্যহিকতার বিবর্ণ প্রলেপে। ...আসলে আমার মনে হয় নর-নারীর প্রেমের রক্ষাকবচ দূরত্ব। বিচ্ছেদে ও বিরহেই প্রেমের সার্থকতা। বিকাশ ও সৃজনশীলতা। একটু গভীর করে দেখলে বলা যায়, প্রেম সৃষ্টির একটা চিরন্তন প্রবাহ। একটা গোপন মন্দাকিনী ধারা, যে নিজেই একক।(*যেখানে দাঁড়িয়ে আছি*, পৃ. ১৬৮-১৬৯)

শেষ পর্যন্ত তাই ভালোবাসার মানুষ শিল্পী শাহনুরকে বিয়ে করেনি চম্পা। বাবা-মার নির্বাচিত পাত্র মাশুককে বিয়ে করতে সম্মতি জ্ঞাপন করে সে। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা থেকে শেষ পর্যন্ত সে খুঁজে নিয়েছে বিরহ, নিঃসঙ্গতা ও অন্তর্লোকের দুর্ভর যন্ত্রণা। তাই নিঃসঙ্গতা ও যন্ত্রণা সম্পর্কে তার ভাবনা হয় এরকম–

> আমি চলে যাচ্ছি; কিন্তু আমি তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ-আমার প্রেম, আমার বিরহ। (*যেখানে দাঁড়িয়ে আছি*, পৃ. ১৭১)

উপন্যাসের সমাপ্তিতে আলাউদ্দিন আল আজাদ চম্পার চেতনালোকে নিয়ে এসেছেন প্রেমবিচ্ছিন্ন আত্মমুক্তির নতুন ব্যঞ্জনা। পরিবার ও সমাজে প্রেমের যে নষ্টস্বরূপ সে প্রত্যক্ষ করেছে, তা থেকে আত্মউত্তরণের উপায় সে আবিষ্কার করেছে এবং নবতর ভাবনায় স্থিত হতে চেয়েছে।

যেখানে দাঁড়িয়ে আছি উপন্যাসটি উত্তম পুরুষে রচিত। কখনো কখনো চরিত্রসমূহের অন্তর্ময় দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হলেও উপন্যাসের কার্যকারণশৃঙ্খলা ব্যাহত হয়নি। এ উপন্যাসে প্রকরণশৈলী নির্মাণে আলাউদ্দিন আল আজাদ বিশেষ মনোযোগী ছিলেন বলে মনে হয় না।

স্মৃতিমন্থনসূত্রে এ উপন্যাসে ব্যবহৃত মুক্তিযুদ্ধের বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা বেশ তাৎপর্যমণ্ডিত করে প্রকাশ করেছেন তিনি।

যেখানে দাঁড়িয়ে আছি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র চম্পা। সে-ই এ উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের মূল উৎস। চম্পা আত্মমগ্নতা আর আত্মপ্রেমের মাঝেই বিলুপ্ত হয়েছে। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে অসঙ্গতির দোলাচলে সমর্পিত হয়ে সে পরিশেষে নবতর বিশ্বাসে জাগ্রত হয়েছে। নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়নি সে। বরং বাবা-মায়ের নির্বাচিত পাত্রকে বিয়ে করতেই স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়েছে । এজন্যই চরিত্রটি হয়ে উঠেছে স্বাভাবিক ও উজ্জ্বল।

রাশেদা খাতুন সংসারে বিচিত্র প্রতিকূলতার মধ্যে বসবাস করেও ইতিবাচক প্রত্যয়ে জাগ্রত হতে পারেননি। স্বামী মঞ্জুর হাসানের অনৈতিক কার্যকলাপের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি নিজেই হারিয়ে গেছেন পঙ্কিল জীবনাস্রোতে।

ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ আকরাম হোসেন এবং কবি ও গীতিকার হুমায়রা সুখী দম্পতি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময়ে মৃত্যুবরণ করেন সৈয়দ আকরাম হোসেন। সহযোগিতার মনোভাব ও মঙ্গলকাঙ্ক্ষী হিসেবে হুমায়রাও বেশ উজ্জ্বল চরিত্র।

শম্পা, শাহনুর, আব্দুল মাজেদ, হাজেরা, মাশুক, গফুর, লিটন, সৈয়দ আশরাফ হোসেন, জুবায়দা, লোকমান, জিনিয়া, মর্জিনা, টোকা মিঞা প্রমুখ চরিত্র ঘটনার প্রয়োজনে টেনে এনেছেন ঔপন্যাসিক। কিন্তু চরিত্রগুলো তেমন বিকশিত হয়ে উঠতে পারেনি।

যেখানে দাঁড়িয়ে আছি উপন্যাসের ঘটনা ও পরিণামের বর্ণনায় কখনো কখনো নৈসর্গিক পরিচর্যার আশ্রয় নিয়েছেন লেখক। এর ফলে উপন্যাসে সাধিত হয়েছে স্বস্তিকর আবহ। যেমন:

> দক্ষিণের ঘরে কয়েকটি জানালা, ফুরফুরে হাওয়া আসে ... বৈশাখ মাস, সন্ধ্যের একটু আগে সারা প্রকৃতি ঝিম ধরেছিল, ওদিকে ঝিঁঝিঁ পোকার গান। ঘন গাঢ় সবুজ ছাওয়া সিঁদুরে গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে ছিলাম ওই যে কা কা করছে কাকগুলো তাদের কেউ যদি কোন একটা বোঁটায় ঠোকর দিত। (*যেখানে দাঁড়িয়ে আছি*, পৃ. ১৫৪-১৫৫)

উপন্যাসের বিষয়বস্তুকে আরও উপভোগ্য করার প্রয়োজনে মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যের কিছু পদ ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক। যেমন:

১. এ ভরা ভাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর। (*যেখানে দাঁড়িয়ে আছি*, পৃ. ১৪৩)

এ উপন্যাসে চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে উপমা-অলংকার ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক। কয়েকটি দৃষ্টান্ত:

১. রকিং চেয়ারটার পেছনে দুহাত রেখে আমি দাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো। (*যেখানে দাঁড়িয়ে আছি*, পৃ. ১৪৩)
২. আমি লাফাতে পারলাম না; পাথরের মূর্তির মতো জমাট বেঁধে গেলাম। (*যেখানে দাঁড়িয়ে আছি*, পৃ. ১৪৪)
৩. চম্পা তোমার হাসিটা মোনালিসার হাসির মতো। (*যেখানে দাঁড়িয়ে আছি*, পৃ. ১৬৭)

যেখানে দাঁড়িয়ে আছি উপন্যাসে আলাউদ্দিন আল আজাদ চলিত গদ্যরীতি ব্যবহার করেছেন। কখনো কখনো চরিত্রপাত্রের অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের প্রয়োজনে তিনি ব্যবহার করেছেন ইংরেজি শব্দ।

আলাউদ্দিন আল আজাদ এ উপন্যাসে ক্ষুদ্র পরিসরে নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণির জীবনযাপনের চিত্র, মুক্তিযুদ্ধের বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও স্বাদেশিকচেতনা এবং প্রেমসম্পর্কিত উপলব্ধি শিল্পরূপময় করে উপস্থাপন করেছেন। স্বাধীনতা-উত্তর এই উপন্যাসটি শিল্পান্তর্গত করে উপস্থাপনায় তিনি যে সফল হয়েছেন তা নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করা যায়।

শ্যামল ছায়ার সংবাদ

আলাউদ্দিন আল আজাদের *শ্যামল ছায়ার সংবাদ*[১] (১৯৮৬) রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ উপন্যাস। স্বাধীনতা-উত্তর উচ্চবিত্তশ্রেণির জটিল জীবনরূপ, সমাজতান্ত্রিক জীবনচেতনা

[১]আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'শ্যামল ছায়ার সংবাদ', *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, গতিধারা, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০১। বর্তমান গ্রন্থে 'শ্যামল ছায়ার সংবাদ' উপন্যাসের পাঠ এ সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে। *সাপ্তাহিক বিপ্লব* পত্রিকার ঈদসংখ্যায় এটি প্রথম

ভিত্তিক রাজনীতি, প্রতিরোধ ও শ্রেণিসংগ্রাম, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, গণমানুষের জাগরণ প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়েছে *শ্যামল ছায়ার সংবাদ* উপন্যাসটি। উপন্যাসের সমগ্র ঘটনা আবর্তিত হয়েছে মেরিনা চরিত্রকে অবলম্বন করে।

বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি হাসিনা জামান ও আহমদ রায়হানের বিচ্ছিন্ন দাম্পত্যজীবন, সাংবাদিক জাহিদ হাসানের প্রতিবাদী কণ্ঠ, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনের জটিলতা, প্রেমলিপ্সা প্রভৃতি এ-উপন্যাসের বিচ্ছিন্ন ঘটনাংশ। বামপন্থী রাজনীতিবিদ আহমদ রায়হান ভালোবেসে বিয়ে করেছিল আমানউল্লাহ চৌধুরীর কন্যা হাসিনাকে। কিন্তু তাদের এই বিয়ে মেনে নিতে পারেননি হাসিনার বাবা। কারণ হাসিনার বাবা পাকিস্তানি ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সেজন্য রায়হানকে কখনও মনে-প্রাণে গ্রহণ করেননি তিনি। এতৎপ্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের ভাষ্য:

> আমানউল্লাহ চৌধুরী লীগের বিরাট স্তম্ভ ছিলেন, তখনকার ক্ষমতাসীন জান্তার সঙ্গে তাঁর খাতির। ... একমাত্র মেয়ের এই অধঃপতনের কথা জানামাত্র গর্জন করে উঠেছিলেন, কি এতবড় আসপর্দা! আমার মেয়েকে ভাগিয়ে নিয়েছে—ওরে তোরা কোথায়? যা যা দৌড়ে যা, ওই নিশাচর নেড়ি কুত্তাটারে টেনে টেনে ছিঁড়ে ফ্যাল। (*শ্যামল ছায়ার সংবাদ*,পৃ. ৪৭৭)

রায়হান ও হাসিনার বিবাহিত জীবনের ফসল একমাত্র মেয়ে মেরিনা। বিপ্লবী ও মার্কসবাদী নেতা রায়হান নয়নপুর গ্রামে বাস করতে না পেরে ভয়ে পালিয়ে যায় লন্ডনে, স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে। একই গ্রামের রায়হানের বন্ধু সৈয়দ মোহাম্মদ আমিরুলজ্জামান লন্ডনে আইন বিষয়ে অধ্যয়নরত। আমিরুলজ্জামান মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বন্ধু আহমদ রায়হানের সঙ্গে এবং বন্ধুপত্নী হাসিনাকে জীবনসঙ্গী করে নিয়েছে। এমনকি নয়নপুর গ্রামেও বেআইনিভাবে জমি দখল করে সে গড়ে তুলতে চায় জামান শিল্পনগরী। কিন্তু সংগ্রামশীল ভূমিহীন চাষী ও ক্ষেতমজুরদের প্রতিবাদের কারণে সফল হতে পারেনি জামান।

নয়নপুর গ্রামের সন্তান তরুণ সাংবাদিক জাহিদ হাসান পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশ করে ও সংঘশক্তি গড়ে তুলে জামানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেয়। অতঃপর নয়নপুর গ্রামে চৌদ্দ বছর পর হাসিনা, জামান ও রায়হান নানা পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। সেই গ্রামে জমি দখলের

প্রকাশিত হয় (১৯৮৪)।

এক পর্যায়ে পুলিশ ও সাধারণ জনতা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। শত শত বস্তি আগুনে ভস্মীভূত হয়। এতৎপ্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের বক্তব্য:

> ... বহু লোকের কণ্ঠস্বর ক্রমে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকে; কিন্তু যা আসল, বাতাসে ভর করে যেন ছুটে আসছে আগুন, আগুনের পর আগুন। শত শত, মনে হয় হাজার মশাল।(*শ্যামল ছায়ার সংবাদ*,পৃ. ৪৮৫)

এ-ভয়ংকর পরিস্থিতির একটি পর্যায়ে সকল দ্বন্দ্বের অনাকাঙ্ক্ষিত অবসান ঘটে। শেষ পর্যন্ত হাসিনা জামান ও রায়হানকে গুলি করে হত্যা করেন এবং নিজেও আত্মহত্যা করেন। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে দেখা যায় জাহিদ ও মেরিনা যাত্রা করেছে উদ্দেশ্যহীন গন্তব্যে। মেরিনার জীবননাট্যে সংযোজিত হয়েছে অন্তর্দ্বন্দ্বের জটিল যন্ত্রণা।

এই উপন্যাসের মুখ্য ঘটনার পাশাপাশি অভিনীত হয়েছে আরও অনেক পার্শ্ব ঘটনা। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের প্রেমের ব্যবধানকে দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক সচেতনভাবে। উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান রোমিওকে ভালোবেসেছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির সন্তান লুবনা করিম। কিন্তু লুবনার আশা ও ভালোবাসাকে স্বীকৃতি দেয়নি রোমিও। একপর্যায়ে দুজনের ভুল বোঝাবুঝির কারণে লুবনা করিম আত্মহত্যা করে।

শ্যামল ছায়ার সংবাদ উপন্যাসে আলাউদ্দিন আল আজাদ শহর ও গ্রামের বিচিত্র জীবনধারা অঙ্কনে বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। স্বাধীনতা-উত্তর কয়েক বছরের খণ্ড খণ্ড ঘটনাকে উপলক্ষ করে ঔপন্যাসিক রূপায়ণ করেছেন উপন্যাসটি।

উপন্যাসের কোন চরিত্রকেই অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়নি। মূলত *শ্যামল ছায়ার সংবাদ* উপন্যাসের কাহিনি বলয়িত হয়েছে হাসিনা, মেরিনা, জাহিদ, রোমিও, লুবনা, জামান ও রায়হান এই সাতটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসের চরিত্রগুলি গতানুগতিক। কোনো চরিত্রই শেষ পর্যন্ত বিকশিত হয়ে ওঠেনি।

শ্যামল ছায়ার সংবাদ সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ অবলম্বনে রচিত। কখনো কখনো ঘটনাংশকে প্রাগ্রসর করার প্রয়োজনে লেখক চরিত্রচিত্তের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসে বামপন্থী ও বিপ্লবী নেতা আহমদ রায়হানের বিদেশ গমন ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, প্রতিশোধস্পৃহা ও

জাগরণের দিকটি দক্ষতার সঙ্গে প্রদর্শন করেছেন ঔপন্যাসিক। তরুণ সাংবাদিক ও প্রতিবাদী কণ্ঠ জাহিদ হাসানের গণমুখী সংগ্রাম , নয়নপুর গ্রামে শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্বযুদ্ধ, নিম্নবিত্ত মানুষের প্রতিবাদী আন্দোলন ও হাসিনার মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব প্রভৃতি রূপায়ণে লেখক বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

উপন্যাসের ঘটনা, চরিত্রচিত্রণ ও জীবন পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে ঔপন্যাসিক উপমা-অলংকার নির্মাণ করেছেন। যেমন:

১. তার অপরিসীম ঘৃণা ও ক্রোধ অগ্নিশিখার মত লক্‌লক্‌ করে দেখা দিয়েছে। (*শ্যামল ছায়ার সংবাদ,*পৃ. ৪৬৬)
২. একটু অছিলা পেলেই হোলো, ফস্‌ করে সোডা ওয়াটারের মতো উদ্‌গীরণ! (*শ্যামল ছায়ার সংবাদ,*পৃ. ৪৬৭)
৩. তুই এত্তো ভালো মেরী– টসটসে রসগোল্লার মতো। (*শ্যামল ছায়ার সংবাদ,*পৃ. ৪৭৪)
৪. জাহিদের ভিতরে তড়িৎ রেখার মত শিহরণ খেলে গেল। (*শ্যামল ছায়ার সংবাদ,*পৃ. ৪৮২)

এ উপন্যাসে আলাউদ্দিন আল আজাদ ভাষা নির্মাণে চলিত ভাষার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন, যা কখনো কখনো শ্রুটিকটু মনে হয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এতৎপ্রসঙ্গে লক্ষণীয়:

১. দাঁত বার করে হেসে মহব্বত বলল, আমি কিমুন কইরা কইয়াম, আমারে হিখইছেন? (*শ্যামল ছায়ার সংবাদ,*পৃ. ৪৭০)
২. মশালে আগুনে, চতুর্দিকে আলোকিত। কে একজন চেঁচিয়ে বলতে লাগল, আমাগো মিল-কারখানা আমরা তৈয়ার করুম: তুই কোন্‌ বেহশত থে নামছস্‌রে ফোপর দালাল? বাইর অইয়া যা, নাইলে-তোর কল্লা ছিড়ুম- (*শ্যামল ছায়ার সংবাদ,*পৃ. ৪৮৫)

উপন্যাসের প্রথম পর্যায় থেকে রোমিও-লুবনা-মেরিনা প্রমুখ চরিত্রের কাহিনি বর্ণনা করলেও অন্তিম পর্যায়ে মেরিনার অন্তর্জাগতিক শূন্যতা ও একাকিত্বই সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। উপন্যাসের প্রথমে উচ্চবিত্ত শ্রেণির উচ্ছৃঙ্খলতা, প্রতারণা, আনন্দ-ফুর্তি বর্ণিত হলেও মধ্যম পর্যায়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং অন্তিম পর্যায়ে নিম্নবিত্ত শ্রেণির গণজাগরণে ও বিক্ষোভে বুর্জোয়া শ্রেণির পরাজয় বরণ–সবকিছু মিলে এ-উপন্যাসটিতে যে suspense তৈরি হয়েছে তার মূল্য নিঃসন্দেহে অনেক।

Dhaka University Institutional Repository

অনূদিত অন্ধকার

আলাউদ্দিন আল আজাদের *অনূদিত অন্ধকার*[১](১৯৯১) উপন্যাস মূলত নায়ক লিংকন ও নায়িকা মিথুনের প্রেম ও দাম্পত্যজীবনকেন্দ্রিক মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। এ কেন্দ্রীয় ঘটনাংশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উচ্চবিত্তশ্রেণির উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের কিছু চিত্র– অবৈধ প্রেম, ঈর্ষা ও নিঃসঙ্গতা। নগরজীবনের পটভূমিকায় উত্তম পুরুষে বর্ণিত এ উপন্যাসে আরও রূপায়িত হয়েছে নিঃসঙ্গ ব্যক্তির মনোদৈহিক সংকট, আত্মোপলব্ধি, শূন্যতা, হতাশা ও শ্রদ্ধেয় প্রেমানুভূতি।

উচ্চবিত্ত পরিবারের কর্নেল গোলাম মুর্তজা ও নাহিদ জামালের একমাত্র সন্তান গোলাম মোস্তফা লিংকন। পিতৃমাতৃহীন লিংকন উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের এক পর্যায়ে এক দুর্ঘটনার শিকার হয়। যে হাসপাতালে সে ভর্তি হয়, সে হাসপাতালের সেবিকা রুখসানা আহমদ মিথুনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে লিংকনের। এ-হাসপাতালেই বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রফেসর ডা. আশরাফের চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ওঠে লিংকন। ইতোমধ্যে সেবিকা মিথুনকে ভালোবেসে ফেলে লিংকন এবং ডা. আশরাফের সহায়তায় মিথুনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মিথুনের বাবা স্কুল শিক্ষক মাহফুজ আহমদ নিজ আদর্শে দীক্ষিত করেছিলেন তার মেয়েকে। বাবার স্বপ্ন ছিল মেয়ে নার্সিং পেশায় দেশজোড়া প্রতিষ্ঠা পাবে। কিন্তু একপর্যায়ে বাবার সে স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যায়। দাম্পত্যজীবনে ভুল বোঝাবুঝির কারণে মিথুন ট্রেনের নিচে পড়ে আত্মহত্যা করে।

উপন্যাসসূত্রে জানা যায়, মিথুন অত্যন্ত একরোখা ও জেদি। বাবার শৈশবকালীন বন্ধু ডা. আশরাফের সহায়তায় সে হাসপাতালের সেবিকা হিসেবে নিযুক্ত হয়। হোস্টেলেই সে বসবাস করতো। উপন্যাসে মিথুনের স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা ঔপন্যাসিক প্রকাশ করেছেন এভাবে:

> আমি একজন আর্দশ সেবিকা হবো, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মতো। অতটা না হতে পারলেও , কাছাকাছি। সেজন্য আমার একটা প্রোগ্রাম আছে। বিলাতে গিয়ে উচ্চ প্রশিক্ষণ নেবো। সেজন্য স্কলারশিপ দরকার। তার জন্য ফাইট করছি। (*অনূদিত অন্ধকার*, পৃ. ১৯৪)

[১]আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'অনূদিত অন্ধকার', *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, প্রথম প্রকাশ, ২০০০, গতিধারা, ঢাকা। বর্তমান গ্রন্থে 'অনূদিত অন্ধকার' উপন্যাসের পাঠ এ সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে। প্রথম প্রকাশিত হয় *নান্দনিক* পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (জুন ১৯৯১)।

সেবিকার ব্রত পালন করতে গিয়ে মিথুন বাসর রাতেও লিংকনের সঙ্গে আনন্দে আত্মহারা হতে পারেনি। দাম্পত্যজীবনেও তাকে হাসপাতালে প্রায়শই নাইট ডিউটি পালন করতে হতো। তবুও লিংকন সবকিছু সহজভাবে নেয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার অবচেতন মনে একসময় সন্দেহ উদ্রিক্ত হয়। এ পরিস্থিতিতে একদিন নেশাগ্রস্ত হয়ে সে মিথুনের কাছে তার সন্দেহ আর ক্ষোভের প্রকাশ করে:

> ... তুমি কেন নাইট ডিউটি করো। বেশিরভাগই নাইট ডিউটি। কেন? জানি তুমি জবাব দেবে না। সত্য বলার সাহস নেই তোমার। আমিই বলছি, হ্যাঁ আমিই বলছি–তুমি, তুমি আর–আর। ... তুমি আর সালাম অবৈধ সম্পর্কে আবদ্ধ। নাইট ডিউটি তোমার। তোমার প্রতিরাতের অভিসার ! (*অনূদিত অন্ধকার*, পৃ. ১৯৬)

স্বামীর সন্দেহ আর মিথ্যা অভিযোগে ভেঙে পড়েনি সে, কিংবা প্রতিবাদও করেনি। বরং অস্পষ্ট আর্তনাদ আর নীরবতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল মিথুন। অকস্মাৎ একদিন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে তিনদিনের ছুটি চেয়ে দরখাস্ত পাঠায় সে। ছুটির এ-পর্যায়ে সে পরিকল্পিত উপায়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। মিথুনের লেখা দুটি চিরকুটে লেখা ছিল –

> ১. আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। (*অনূদিত অন্ধকার*, পৃ. ১৯৮)
>
> ২. তুমি আমার প্রথম এবং শেষ প্রেম ছিলে। তুমি সবটা বুঝতে না, কিন্তু সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে তোমাকে আমি ভালোবেসেছিলাম। মানুষের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার ছিল আমার চারিত্র্যিক বৈশিষ্ট্য, আমার পিতার শিক্ষা সেখানে ছিল। তুমি আমাকে ভুল বুঝলে, অবিশ্বাস করলে। এজন্য তোমাকে দোষারোপ করবো না। এ আমার বিধিলিপি, আমার কপাল। দুঃখ শুধু, আমার নিপীড়িত পিতার আদর্শকে আরেকটু এগিয়ে নিতে পারলাম না। (*অনূদিত অন্ধকার*, পৃ. ১৯৮)

মিথুনের এই অপমৃত্যুর জন্য লিংকন নিজেকেই দায়ী করে। তাই প্রয়াত স্ত্রীর অপূর্ণ স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত জমিতে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল রুখসানা নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে লিংকন। এই কাজে তাকে সহায়তা করে ডা. আশরাফ।

কিছু সময়ের ব্যবধানে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে মহাঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবলীলা চলছিল। সেই দুর্যোগপূর্ণ রাত্রিতে লিংকন ভাবছিল–আত্মজিজ্ঞাসায় কাতর মিথুনের মৃত্যুর জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী কে ? এ-প্রসঙ্গে লিংকনের আত্ম-উপলব্ধি এরকম:

> তোমার বিরুদ্ধে যে হিংস্রশক্তি আমার ভিতরে উদ্ধত মাথা তুলে জেগে উঠেছিল তার নাম কি। ... তার নাম কি ঈর্ষা নয়? বিভীষিকাময় বিশাল অজগরের মতো যার অন্ধরূপ? ... ঈর্ষা। ঈর্ষাই। পুরনো ওথেলো ঈর্ষাবশে তাঁর প্রাণাধিক, প্রিয়তমা ডেসদোমোনাকে হত্যা করেছিলেন, আমি ঈর্ষাবশে তোমাকে হত্যা করেছি। আমি নতুন ওথেলো। (*অনূদিত অন্ধকার*, পৃ. ২০০)

সেই ঝড়ের রাতে জুলমতের দেয়া তথ্যসূত্রে বাড়িতে একটি ডায়েরি পাওয়া গিয়েছিল। ডায়েরিতে সেই ঈর্ষার রহস্যময় দিক খুঁজে পায় সে। লিংকনের বাবা গোলাম মুর্তজা মেজো শ্যালিকা নাশিদের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে যুক্ত ছিলেন। এক পর্যায়ে শ্বশুর কর্নেল জামাল তার মেয়ে নাশিদের বিয়ে অন্যত্র ঠিক করলে ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে পরিকল্পিতভাবে নাশিদকে হত্যা করে গোলাম মুর্তজা। আইনের চোখে সে ধরা পড়েনি, কিংবা অপরাধীও সাব্যস্ত হয়নি। অজানা এ-তথ্য লিংকনের মনোজগত ছিন্নভিন্ন করে দেয়। সে এর মধ্যে খুঁজে পায় তার অভিশপ্ত জীবনের কার্যকারণসূত্র:

> আমার তমসাচ্ছন্ন উৎসের সন্ধান আমি পেলাম। কিন্তু আইন যাকে ধরতে পারেনি, আমি তাকে ক্ষমা করবো না। ... সে যখন নারী হত্যা করে তখনই আমি আমার মায়ের গর্ভে এসেছিলাম। তার দূষিত রক্ত দিয়েই সে আমাকে নির্মাণ করেছে, আমাকে ধ্বংস করেছে। (*অনূদিত অন্ধকার*, পৃ. ২০৩)

যে ঈর্ষার কারণে লিংকনের খালা নাশিদকে হত্যা করা হয়েছিল তার বাবা, সে বাবার রক্তধারা তো তার ধমনিতেও প্রবাহিত। সেই পূর্ব পুরুষের রক্তস্রোতে যে ঈর্ষা বহমান সে ঈর্ষার কারণে ভালোবাসার স্ত্রীকে হারাতে হয়েছে তাকে। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে মিথুন-লিংকন দম্পতি। লিংকনের এ-উপলব্ধির সঙ্গে নিয়তিবাদের প্রভাব প্রযুক্ত করেছেন ঔপন্যাসিক।

উপন্যাসের অন্তিম পর্যায়ে দেখা যায়, অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত পথহারা এক যুবক লিংকন। স্ত্রীর মৃত্যুতে সে-প্রকৃতই দিশেহারা, উদ্ভ্রান্ত। সে সময়ে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে দেশের দক্ষিণাঞ্চল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে বন্ধু জাহিদের সহযোগিতায় আর্ত মানবতার সেবায় সে নিয়োজিত করে নিজেকে। অজানাকে জানার প্রত্যয়ে এগিয়ে চলে সে; মানবসেবার মধ্যে সন্ধান করে নবতর জীবনার্থ।

অনূদিত অন্ধকার উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের পাশাপাশি লিংকন এবং মিথুনের দৃষ্টিকোণও প্রযুক্ত হয়েছে। উপন্যাসের পটভূমিরূপে ব্যবহৃত হয়েছে আধুনিক জটিল নগরজীবন। শাহরিক জীবনের জটিলতা ও বিচিত্র ঘটনাবলি এ-উপন্যাসের রসপ্রতিপত্তিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। স্বল্প পরিসরের এ-উপন্যাসে এসেছে বিচিত্র

চরিত্র ও আধুনিক জীবনরূপ। আলাউদ্দিন আল আজাদ ঘটনার উপযোগী করে চরিত্রচিত্রণ করেছেন। তাঁর চিত্রিত চরিত্রগুলো বাস্তবতার প্রতিনিধি বলে উপন্যাসপাঠের পর কাউকে কৃত্রিম বলে মনে হয় না। প্রফেসর ডা. আশরাফ, নাজিন মাসুদা, জুলমত, মর্তুজা, মাহফুজ আহমদ, ফারজানা, কর্নেল জামাল, জাহিদ প্রমুখ চরিত্র হয়ে উঠেছে লেখকের মনোভাবের বাহন।

স্বাধীনতা-উত্তর এদেশীয় সমাজব্যবস্থায় উচ্চবিত্ত শ্রেণির উচ্ছৃঙ্খলতা, দায়িত্বহীনতা, অন্তর্যন্ত্রণা, যৌনতা, হতাশা, প্রভৃতি সত্যস্বরূপে এ-উপন্যাসে অঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক। সীমিত পরিসরের এ-উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে আধুনিক জীবনের প্রতিচ্ছবি।

স্বপ্নশিলা

আলাউদ্দিন আল আজাদের *স্বপ্নশিলা*[১] (১৯৯২) নাগরিক জীবনের পটভূমিতে রচিত একটি রোমান্টিক প্রেমকাহিনি। উত্তম পুরুষে বর্ণিত এ উপন্যাসে শাহাদাত হোসেন প্রধান ও সাহেরা খাতুনের প্রেমসম্পর্কিত কাহিনি শিল্পমূল্য অর্জন করেছে। উপন্যাসের মূল চরিত্র শাহাদাত হোসেন প্রধান একজন লেখক। স্বল্প পরিসরের এ উপন্যাসটিতে শাহাদাতের অতীতস্মৃতি ও জীবন বাস্তবতা মুখ্য বিষয় বলে চিহ্নিত হয়েছে। উপন্যাসে রোমান্টিক প্রেমকাহিনির পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গও বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

বাল্যবেলা থেকেই শাহাদাত তার দূরসম্পর্কের মামাতো বোন সাহেরা খাতুনকে ভালোবাসতো। দুজনেই ছিল সাহিত্যের সমঝদার। সাহেরা দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প পড়তে ভালোবাসতো, অন্যদিকে শাহাদাতের স্বপ্ন ছিল বিশ্বখ্যাত লেখক হওয়ার। শাহাদাতের সাহিত্যচর্চা ছিল সাহেরাকেন্দ্রিক। তার রচনায় কোনো না কোনোভাবে ঠাঁই পেয়ে যেতো সাহেরা।

> বয়স বাড়লে জেনেছিলাম, নারী রহস্যময়ী; কিন্তু সেই কৈশোরকালে কেবল মনে হতো, মেয়েরা সুন্দর জিনিশ। ... প্রথম দিকে আমি বেশি লিখতাম। এবং আমার একটা আলাদা খাতা ছিল—ওকে লক্ষ্য করে, ওর জন্যই রচিত কবিতাবলী। বলা যায়, প্রেমকাব্য। (*স্বপ্নশীলা*, পৃ. ২২৩)

[১]আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'স্বপ্নশীলা', *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, গতিধারা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০০, ঢাকা। বর্তমান গ্রন্থ 'স্বপ্নশীলা'-র পাঠ এ সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ঈদসংখ্যা *পালাবদল*-এ (১৯৯২)।

শাহাদাত ও সাহেরার মধ্যে প্রেমসম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও সাহেরার বাবার অসুস্থতা ও অসহায়তার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যত্র বিয়ে দেওয়া হয় সাহেরাকে। সাহেরার বাবা মোহাম্মদ আজিমউদ্দিন সরকারের অনুরোধে শাহাদাতের বড় দুলাভাই সৈয়দ আসাদুজ্জামানের মধ্যস্থতায় সাহেরার বিয়ে হয়। এই বিয়েতে সাহেরা সে প্রতিবাদ করেনি পরিবারের কথা ভেবে। সাহেরার বিয়ে প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের ভাষ্য:

> সাহেরা আপত্তি জানালো না। কোন উচ্চবাচ্য করলো না। হাতে মেহেদী, গায়ে হলুদ। সব আমার চোখের সামনে ঘটেছে, ভালয় ভালয় শেষ হল। (*স্বপ্নশীলা*, পৃ. ২৩১)

সাহেরার অন্যত্র বিয়ে হবার পর শাহাদাত আর কাউকে বিয়ে করেনি। ঢাকা শহরে বিশটি বছর সে কাটিয়েছে ভবঘুরের মতো। বড় বোনের বাসায় থাকতো সে। কঠিন বাস্তবতার মধ্যেও তার কখনো ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি। নীরবে সে কেবলই সাহেরাকে তপস্যা করেছে। এতৎপ্রসঙ্গে শাহাদাতের আত্ম-অনুভব লক্ষণীয়:

> আমি বেকার, একটা ভবঘুরে। কেউ কেউ আড়ালে টাউটও বলে। খুদকুঁড়া কুড়িয়ে, মলিন পোশাকে বিষণ্ন চেহারায় এই ঢাকা শহরেই বিশটি বছর কাটিয়ে দিলাম। ... আমার যৌবন, আছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু আছে আমার যৌবনের স্মৃতি। যৌবনের উন্মাদনা। এবং বিদ্রোহ, যদিও সে নিঃশব্দ নীরব শ্যাওলা ধরা পাথরের মতো।(*স্বপ্নশীলা*, পৃ. ২৩২)

ইতোমধ্যে শাহাদাত যে উপন্যাসটি লিখেছিল সেটি ছিল সাহেরার জীবনকেন্দ্রিক। কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণ ঘটেছে বলে পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি সারা গুলশান মাহমুদ (সাহেরা খাতুন) পাণ্ডুলিপির বেশকিছু অংশ লাল কালি দিয়ে চিহ্নিত করেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা স্বাধীনভাবে কেন জীবনধারণ করতে পারে না – এ তত্ত্বকথা যুক্ত হয়েছে পাণ্ডুলিপির উপসংহার অংশে। একটি সাদা কাগজে সারা গুলশান মাহমুদ মন্তব্য করেন –

> ... পুরুষ রচিত সাহিত্যে নারী কখনো প্রেয়সী, কখনো ডাকিনী, কখনো দেবী, রাক্ষুসী, কখনো সতী-সাধ্বী কখনো দুশ্চরিত্রা। অর্থাৎ পুরুষ আপন খেয়ালখুশিমত নারীচরিত্র অঙ্কন করেছেন। ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য পৃথিবীতে নারীর উৎপত্তি হয়েছে, এই তত্ত্বকথাই যেন পুরুষ লেখকেরা সোচ্চারে বর্ণনা করেছেন। ...এখন লেখকরা নারীকে যদি পুরাতন দৃষ্টিতেই দেখেন, তাহলে ভীষণ ভুল করবেন।(*স্বপ্নশীলা*, পৃ. ২৩৫)

উপন্যাসের অন্তিম পর্যায়ে দেখা যায়, সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে শাহাদাত-সাহেরা পরস্পরের মুখোমুখি। সাহেরা তার নিজের বিবাহ বিষয়ক সমস্ত ঘটনা শাহাদাতকে ব্যক্ত করে এবং বলে, সে বিবাহ করেছে নিতান্তই পারিবারিক চাপে। প্রকৃতপক্ষে এসব অজুহাত প্রদানের কোনো প্রয়োজন ছিল না। কারণ দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে দাঁড়িয়েও শাহাদাত এখনও সাহেরার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। শাহাদাতকে তাই প্রগাঢ় আবেগে সাহেরা বলে ওঠে:

> শাহাদাত! আমিও তোমাকে চাই, তোমাকে একান্ত করে পেতে চাই। পেতে চাই চিরকাল। আর-আর, সেজন্যই তোমার ইচ্ছা পূরণ করবো না। মনে নেই? বলতাম দুঃস্বপ্নের কথা? সেই কঠিন উপলব্ধি আমার স্বপ্নশিলা, যার মধ্যে আঘাত খেয়ে খেয়ে বারবার আমার আশার জাহাজ ভেঙে ভেঙে পড়ে। ... আমি বুঝি মিলনে প্রেমের মৃত্যু। (*স্বপ্নশিলা*, পৃ. ২৩৮)

আলাউদ্দিন আল আজাদের *স্বপ্নশীলা* উপন্যাসটি উত্তম পুরুষে বর্ণিত। শাহাদাত হোসেন প্রধানই এই উপন্যাসের কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। যেহেতু উপন্যাসটি চরিত্রপ্রধান, সেহেতু কাহিনির বাস্তবতা চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। কথক কখনো স্মৃতিচারণে, কখনো সরল কথকতায় কাহিনি পরিবেশন করেছেন। উপন্যাসের প্রত্যেকটি ঘটনার সাক্ষী শাহাদাত হোসেন প্রধান।

উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি চরিত্র সরল ও অজটিল। শাহাদাত হোসেন প্রধান, সারা গুলশান মাহমুদ ও মারফত আলি সরকার ছাড়া অন্য কোনো চরিত্র উজ্জ্বল ও বিকশিত হয়ে ওঠেনি। উপন্যাসের প্রায় সর্বত্র রোমান্টিক আবহ বিরাজিত। ব্যক্তির সুখ-দুঃখের বর্ণনা ব্যক্তির জবানিতে উপস্থাপিত হওয়ায় এ-উপন্যাসের অনেক এলাকাই হয়ে উঠেছে গীতময়। কখনো কখনো বিচ্ছিন্ন কিছু বর্ণনাংশের মধ্যে লক্ষ করা যায় স্মৃতিবিধুরতা।

এ-উপন্যাসের ভাষা বিবরণধর্মী, সহজ-সরল। লেখক কাহিনি ও চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উপমা-অলংকার ব্যবহার করেছেন:

১. আমাকে দেখামাত্র যে স্মিতহাস্য তার অধরকোণে খেলে গেল তা সিনায় চাক্কু মারার মত। (*স্বপ্নশীলা*, পৃ. ২১২)
২. পালতোলা নৌকাগুলো ভেসে চলেছে হংসশ্রেণীর মত। (*স্বপ্নশীলা*, পৃ. ২২৮)
৩. ... প্রতিদিন আমি শান্ত নদীর মত বয়ে যাই; ঝড় এসে তোলপাড় করলেও ব্যতিব্যস্ত হই না। (*স্বপ্নশীলা*, পৃ. ২২৯)
৪. ... আমার প্রথম যৌবনের দুলর্ভ মুহূর্তগুলোকে স্মৃতির ধ্বংসস্তূপের অভ্যন্তরে প্রত্নশিল্পের মতো

চাপা দিয়ে রেখেছিলাম। (*স্বপ্নশীলা*, পৃ. ২২৯)

৫. আমার চেহারা কখন লুই পাস্তুরের মতো হয়ে গিয়েছিলো, জানতাম না। (*স্বপ্নশীলা*,পৃ. ২৩১)

উপন্যাসের কাহিনি গতানুগতিক; পরিণামও একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন। প্রকরণ বিন্যাসে লেখক ছিলেন অনেকবেশি উদাসীন। ফলত এটি শিল্পমূল্যমানে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত নয়।

অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি

স্বাধীনতা-উত্তর বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের বহুভঙ্গিম জটিলতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে আলাউদ্দিন আল আজাদের *অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি*[১](১৯৯৩) উপন্যাসে। নগরজীবন ও পরিবেশের সংগ্রাম, আশা-আকাঙ্ক্ষা-হতাশা, নিঃসঙ্গতা, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, স্বপ্নচারিতা, মনোবিকার, প্রেম, অবিশ্বাস প্রভৃতি আলাউদ্দিন আল আজাদের *অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি* উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। উত্তম পুরুষে বর্ণিত স্বল্প পরিসরের এই উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে নগরজীবন।

*অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি*র সূচনা পর্যায়ে দেখা যায়– নূরুল ইসলাম শুজা গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন, মনোজগতের অবচেতন স্তরে অতলভাবনায় সমর্পিত। একমাত্র বোন জাহান আরা আদিবকে কেন্দ্র করে তিনি নিরন্তর চিন্তামগ্ন। একসময় গ্রামে অবস্থানকালে জাহান ভালোবেসেছিল শুজার বাল্যবন্ধু মাহবুব মোরশেদ খানকে। ঢাকা কলেজ থেকে বি.কম. পাস করে এখন দুই বন্ধু পরস্পরবিচ্ছিন্ন ও যোগাযোগহীন। নাগরিক জীবনে শুজার দিন কাটছে ঘোরতর অনিশ্চয়তায়। এরকম পরিস্থিতিতে মিরপুর রোডে তার সাক্ষাৎ ঘটে বাল্যবন্ধু মোরশেদের (রাজা) সঙ্গে। বন্ধু রাজাই তাকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে এবং নিজের কোম্পানিতে চাকুরি দেয়। অতঃপর রাজার সঙ্গে শুজার সম্পর্কের নতুন অধ্যায়ের শুরু। এতৎপ্রসঙ্গে শুজার আত্মঅনুভব লক্ষণীয়:

[১]আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি', *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, গতিধারা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০০, ঢাকা। বর্তমান গ্রন্থে 'অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি'-র পাঠ এ সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ঈদসংখ্যা *পালাবদলে* (১৯৯৩)।

> আমি এখন বিসিএস(টি)-এর অনারেবল মেম্বর। ... টাউটগিরি করে দিন চলছে না, এটাই ক্রাইসিস। (*অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি*, পৃ. ২৫০)

নিউ ওয়ার্ল্ড ট্রেডিং কোম্পানিতে অর্থাৎ মোরশেদের কোম্পানিতে পাবলিসিটি অফিসার হিসেবে কর্মরত শুজা। কিন্তু উপন্যাসের মূল ঘটনা মোরশেদ জাহানকে কেন্দ্র করেই অগ্রসর হয়েছে। একই গ্রামে আশৈশব বেড়ে উঠেছে শুজা, মোরশেদ ও জাহান। ছোটবেলা থেকেই মোরশেদ ও জাহানের মধ্যে গড়ে ওঠে প্রেমসম্পর্ক। কিন্তু তাদের প্রেমের কথা পরিবারের কেউই অবগত ছিল না। সেই গোপন প্রেম একসময় ধরা পড়ে যায় শুজার কাছে। কিছুদিন পর জাহানের পরিবর্তে মোরশেদ স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে শহীদ বুদ্ধিজীবী আশরাফুল আলম খানের কন্যা দিলরুবারকে।

জাহান নীরবে সব প্রত্যক্ষ করেছে; কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে মোরশেদের বিবাহকে স্বাগত জানিয়েছে। একসময় সে তার অন্তর্যন্ত্রণার বিষয়টি ব্যক্ত করে ভাই শুজার কাছে। ভাইকে উদ্দেশ্য করে জাহান বলে:

> ... সে-ই ছিল আমার সর্বস্ব, আমার প্রথম ও শেষ প্রেম, আমার ভালোবাসা। ... কিন্তু শেষ পর্যন্ত, মরলাম না । মনে হল, দূর থেকে আমি ওর সুখ দেখবো, আর সে-ই হবে আমার বেঁচে থাকার সুখ। (*অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি*, পৃ. ২৭৬)

জাহানের সঙ্গে প্রতারণা করেছে মোরশেদ। কিন্তু জাহানের সঙ্গে মোরশেদের প্রেমসম্পর্কের তথ্য জানা সত্ত্বেও মোরশেদের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করেনি শুজা, বরং জাহানকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করেছে।

মোরশেদের বিয়ের জাঁকালো অনুষ্ঠানে জাহানও উপস্থিত ছিল। অতিথি অ্যাপায়নের কাজে সম্পৃক্ত ছিল শুজা। বরের বেশে মোরশেদকে দেখেছিল জাহান। নবদম্পতিকে পাশাপাশি বসতে দেখেও জাহান আদৌ ভেঙে পড়েনি। কিন্তু জাহানের অন্তর্দহন উপলব্ধি করেছে একমাত্র ভাই শুজা। উৎসব শেষে সবাই যখন বাড়ি ফিরছিল তখন শুজারও মনোজগতে বোনের কষ্টক্লান্ত প্রতিচ্ছবি:

> বাইরে নিবিড় অন্ধকার, অনেক রাত যেন হয়ে গেছে। তারকাখচিত গভীর অন্তরীক্ষ, আর আমি হেঁটে চলেছি বৃক্ষরাজির মধ্যে দিয়ে। আকস্মাৎ থমকে দাঁড়াই। একটি সবুজ গাছের গুঁড়িতে

> একজন নারী, মনে হল, যুবতী। কালো কেশরাশি একপাশ দিয়ে পড়েছে, তবু কে চেনা যাচ্ছে না। আমি প্রশ্ন করে উঠলাম, তুমি কে, এখানে ? কে তুমি ? পরিচয় দাও। (*অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি*, পৃ. ২৭৬)

উপন্যাসের অন্তিম পর্যায়ে দেখা যায়, মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান জাহান আরা আদিব প্রেমবিচ্ছিন্ন এক নিঃসঙ্গ নারী। তার জীবন গভীর নৈঃসঙ্গ্যে সমর্পিত। বেদনাই হয়ে উঠেছে তার বিধিলিপি। তার যন্ত্রণা শুজাকেও সমর্পিত করে অনামা যন্ত্রণায়:

> আমার চোখের ভিতর থেকেও অশ্রুকণা বেরিয়ে আসতে থাকে ক্রমান্বয়ে, যার কোন অর্থ ছিল না। (*অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি*, পৃ. ২৭৬)

আলাউদ্দিন আল আজাদ উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন *অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি* উপন্যাসের কাহিনি বর্ণনায়। এ উপন্যাসে 'আমি' অর্থাৎ নূরুল ইসলাম শুজার কথকতায় সমগ্র কাহিনি বর্ণিত। উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী সে। অনেক সময় কথক স্মৃতিময় অনুষঙ্গে কাহিনিকে প্রাগ্রসর করেছেন।*অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি* উপন্যাসের কথনরীতির একটি দৃষ্টান্ত:

> শরীর জুড়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছিল, আমি ছুটতে চাইছিলাম, কিন্তু দুই পা যেন শিকল দিয়ে বাঁধা। হাতেও ঝক্‌মকে শিকলের বেড়ি। আমাকে কি বোবায় ধরেছে? হয়তোবা, কিংবা অন্যরকম কিছু। (*অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি*, পৃ. ২৪১)

উপন্যাসের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত প্লট বর্ণনা সরলরৈখিক। এ উপন্যাসের মোরশেদ, জাহান, শুজা ছাড়া প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্র খণ্ডিত। দিলরুবা চরিত্রটি একপর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলেও শেষ পর্যন্ত অনুজ্জ্বল। রুখসানা (সানাবুবু), আশরাফুল আলম (আশা), টিনা, ডলি, রুমানা, মোস্তফা আনোয়ার পাশা, দানেশ পণ্ডিত, শামসুল ইসলাম দারা, মধু ব্যাপারী, রোশনি প্রমুখ চরিত্র ঘটনার প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়েছে। স্বল্প পরিসরে রোশনি চরিত্রটি এ উপন্যাসে হয়ে উঠেছে প্রাণবান।

অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি উপন্যাসে নিসর্গ-প্রকৃতির অনবদ্য ব্যবহার ঘটিয়েছেন ঔপন্যাসিক। যেমন:

> ... জাহান ছোটবেলা থেকে প্রায় একা একাই থাকত। গাছের কাছে, পাখির কাছে। ফুলের কাছে, শস্যের কাছে। পাখির বাসা খোঁজা ছিল বদভ্যাস। বিশেষ করে, টুনটুনির বাসা। ভোমরা ঝোপে

নজর রাখত। টুনটুনি বাসা বানালে, তার পাহারা দিত। কখন ডিম পাড়বে টুনি, সেজন্য প্রতীক্ষার অন্ত থাকতো না। (*অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি*, পৃ. ২৪৭)

জাহানের অন্তর্যন্ত্রণা ও অসহায়ত্ব প্রকাশের সূত্রে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হওয়ায় এ উপন্যাসের বর্ণনা প্রায়শ হয়ে উঠেছে হৃদয়স্পর্শী। প্রাসঙ্গিক অংশ লক্ষণীয়:

এক সময় শোঁ শোঁ বাতাসের শব্দ, কোন্ দূরলোক থেকে এদিকে আসছে বোঝা যায় না। সেই শব্দ যখন ভিতরে এল, আস্তে আস্তে থেমে যায় হৈহুল্লোড়, হাসাহাসি, নৃত্যগীত এবং সবটা দৃশ্য যেন জমে যায়। একেবারে স্থির, অচঞ্চল। নৃত্যের শেষের আঙ্গিকে দুই সারি যুবতী, তাদের মাঝখান দিয়ে পশ্চাৎপটের আড়াল থেকে হেঁটে আসে প্রায় সমান বয়সী একপাল মেয়ে, সামনের দিকে; তাদের মাঝখানে এক সুসজ্জিত কন্যা, নিশ্চয়ই নববধূ। ওরা থেমে গেল, পাদপ্রদীপের কাছে। হাতের কাছে একটা দূরবীক্ষণ ছিল। নিদারুণ কৌতূহল। সেটা তুলে নিতে দেরি করি না। ডান হাতে চোখ লাগিয়ে একটু তাকাতেই হঠাৎ ঝাঁকানি খেয়ে ওঠে সারা শরীর– একি! এ যে জাহান। আমার ছোট বোন, জাহান আরা আদিব! (*অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি*,পৃ. ২৬৩)

অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি উপন্যাসে ঔপন্যাসিক চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে সাবলীল ও প্রাঞ্জলভাবে উপমাসমূহ নির্মাণ করেছেন। কয়েকটি উপমা:

১. আমি তাকিয়ে থাকি শুধু মন্ত্রমুগ্ধের মতো; কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারি না। (*অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি*, পৃ. ২৪১)
২. এখন আমার ভিতরে একটা সন্দেহ ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠেছে, যা হয়তো অমূলক। (*অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি*, পৃ. ২৪২)
৩. ... রিসিভারটা আমার হাতটাকে সাপের মতো আঁকড়ে ধরেছে। (*অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি*, পৃ. ২৪৫)
৪. ... রোদে বৃষ্টিতে ভিজে চেহারাটা হয়ে গেল কাকপক্ষীর মতো। (*অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি*, পৃ. ২৪৯)
৫. ওর চরিত্রে মনে হয় এমন একটা জিনিস আছে, যা সুতীক্ষ্ণ ছুরির মতো। (*অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি*, পৃ. ২৫৮)
৬. পুরো চাঁদটা দুলছে বড় একটা দেয়ালঘড়ির পেন্ডুলামের মতো। (*অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি*, পৃ. ২৬২)
৭. এমন সময় পাশের কক্ষের দরোজাটা কিঞ্চিৎ ফাঁক হয়ে গেলে আমি ভোমরার মতো উড়ে ও ঘরে ঢুকে পড়লাম।(*অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি*, পৃ. ২৬৪)

অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি হয়তো অসাধারণ কোনো উপন্যাস নয়। তবু জীবনের কিছু অস্বাভাবিক বঞ্চনা কোনো কোনো মানুষকে যে কতোবেশি বেদনাবিহ্বল করে তোলে, তার অসামান্য রূপায়ণ ঘটেছে এ-উপন্যাসে।

পুরুদ্রুজ

পুরুদ্রুজ[১] (১৯৯৪) আলাউদ্দিন আল আজাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত রাজনৈতিক উপন্যাস। এ উপন্যাসের পটভূমিতে এসেছে মুসাপুর গ্রাম ও নব্বইয়ের ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল ঢাকা শহর। স্বাধীনতার দুই দশকের ব্যবধানে, নব্বইয়ের ছাত্র আন্দোলনে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামী চেতনা শিল্পীচৈতন্যে কতোটা জীবন্ত রূপ ধারণ করতে পারে, আলাউদ্দিন আল আজাদের *পুরুদ্রুজ* তার প্রমাণ। নরসিংদী জেলার অন্তর্গত মুসাপুর গ্রামের যুবক ও রিক্সাচালক কেরামত গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে অর্থোপার্জনের লক্ষ্যে। আশির দশকে ঢাকা অবরোধ কর্মসূচির মিছিলে কীভাবে সে প্রাণবিসর্জন দেয়– তারই ঘটনাংশ উন্মোচন করেছেন শিল্পী আলাউদ্দিন আল আজাদ। এ উপন্যাসে মুসাপুর গ্রামের মানুষদের জীবন চিত্রাঙ্কনের পাশাপাশি ঢাকা শহরের জীবনবাস্তবতাও অসাধারণ নৈপুণ্যে অঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক।

পুরুদ্রুজ ছয় পরিচ্ছেদে সমাপ্ত ক্ষুদ্রায়তন উপন্যাস। উপন্যাসে গ্রাম ও শহরের জীবনচিত্রাঙ্কনে লেখকের দক্ষতা বিস্ময়কর। এরশাদ সরকারের দুঃশাসন, ক্ষমতার অপব্যবহার, একনায়কতন্ত্রী মনোভাব ও নির্যাতন, নিপীড়নমূলক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের অব্যাহত সংগ্রাম ও সংক্ষোভের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এ-উপন্যাসে। ঢাকার সচিবালয়ের সন্নিকটে গুলিস্তান মোড়ে গণমিছিলে নূর হোসেন প্রাণ দিয়েছিল পুলিশের গুলিতে– এই বাস্তব ঘটনাকে ধারণ করেই পরিকল্পিত হয়েছে এ-উপন্যাস। উপন্যাসের বিষয় ও নামকরণ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন :

> 'পুরুদ্রুজ ' কথাটির অর্থ কি? তার জবাব মুখে মুখে দিতাম। এখন লিখিতভাবে বলছি– পুরুদ্রুজ একটি সংস্কৃত শব্দ, এবং তার নামে এক প্রকার কীট, যার দেহ বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন কীটের জন্ম হয়। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে আত্মদানকারী মূলচরিত্র সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে এই শব্দটির

[১]আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'পুরুদ্রুজ', *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ২০০১, গতিধারা, ঢাকা। বর্তমান গ্রন্থে 'পুরুদ্রুজ' উপন্যাসের পাঠ এ সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক *রোববার;* ঈদসংখ্যায় (১৯৯৪)।

> ধ্রুপদীপ্রতিম গম্ভীর ধ্বনি আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। শব্দটার অর্থের সঙ্গে আন্দোলনের পরিণতির সাদৃশ্য আছে, তা সহজেই লক্ষণীয়।[১]

একদিকে দেশপ্রেম অন্যদিকে ভাবুক অথচ সংগ্রামশীল গ্রামীণ যুবক কেরামত এ উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের কেন্দ্রবিন্দু। মুসাপুর গ্রামের কৃষক নিয়ামত আলী ও গৃহপরিচারিকা পান্নাবিবির সন্তান কেরামত। দারিদ্র্যের কারণে একই গ্রামের হাতেম আলী তালুকদারের বাড়িতে আশ্রয়প্রাপ্ত হয় সে। একসময় সে গ্রামে মধু বিক্রির কাজ ছেড়ে দিয়ে তালুকদারের বাড়িতে কাজ নেয় গৃহভৃত্য হিসেবে। হাশেম আলী তালুকদারের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মেয়ে গুলশানের সঙ্গে কেরামতের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু হাশেমের দ্বিতীয় স্ত্রী তুবাবিবির ষড়যন্ত্রে অন্তঃসত্ত্বা গুলশান মারা যায়। এই ষড়যন্ত্রের জাল থেকে বেরিয়ে জীবিকার সন্ধানে সে পলায়ন করে ঢাকা শহরে। অজানা ও অচেনা এই শহরে এসে তেজগাঁও স্টেশনে আনাজ বেপারির সঙ্গে পরিচয়সূত্রে তারই জুরাইন বস্তির এককোণে ঘর ভাড়া করে বাস করতে থাকে কেরামত। আর সেই বস্তিতেই আনোয়ার আলীর (আনাস বেপারী) স্ত্রী পাঞ্জীবিবি ও মেয়ে গার্মেন্টসকর্মী পঙ্খীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে তার; এবং রিক্সা চালিয়ে জীবননির্বাহ করতে থাকে সে। কিন্তু সেই সময়ে বাংলাদেশে স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনে নেমেছে নানা শ্রেণির মানুষ। এরই মধ্যে হরতাল-অবরোধ-দমন-পীড়ন-মিছিলে ঢাকা শহর হয়ে উঠেছে উত্তাল। স্বৈরাচারী এরশাদের পতনের লক্ষ্যে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলও রাজপথের সংগ্রামে একাট্টা। এদিকে রিক্সা চালাতে গিয়ে নানা শ্রেণির মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে কেরামত। শরীফ মস্তান, ছাত্রনেতা আকরাম, মিছিলে লোক সরবরাহকারী দালাল আজমীর প্রমুখের সঙ্গে তাঁর রচিত হয় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, পাশাপাশি সেও হয়ে ওঠে রাজনীতি-সচেতন। যার পরিপ্রেক্ষিতে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঢাকা-অবরোধ কর্মসূচিতে যোগদান করে কেরামত। এবং এই অবরোধ কর্মসূচির মিছিলে যোগদানের পূর্বে কেরামতের বুকে ও পিঠে রং তুলিতে পঙ্খী লিখে দেয় 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক।' এই শ্লোগানটি সংগ্রহ করেছিল কেরামত একটি পোস্টার দেখে। গণমানুষের আন্দোলনে ঢাকার গুলিস্তানের সন্নিকটে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায় কেরামত। কেরামতের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই উপন্যাসটির সমাপ্তি ঘটে। তার এই বীরত্বব্যঞ্জক আত্মদানে উজ্জীবিত ও উদ্দীপিত হয়

[১] লেখকের কথা, প্রাগুক্ত

সাধারণ মানুষ। উপন্যাসে কেরামতের গুলিবিদ্ধ শরীর এবং মৃত্যুদৃশ্যের বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে এভাবে:

> চতুর্দিকের আচমকা বিচ্ছুরণের একটা প্রচণ্ড নিষ্ঠুর ঝাপটায় বুকে পিঠে রক্তাক্ত হয়ে পড়ে গেল। লাল লাল, তাজা রক্তে রক্তে একাকার। রক্তে রক্তে যেন ডুবে যায়, মুছে যায় লেখাগুলো, চতুর্দিকে থেকে তার উপরে ঝুঁকে পড়েছে বিক্ষুব্ধ মিছিল কিন্তু আশ্চর্য আরও সেই আচ্ছন্ন আলোছায়ায় মোচড় খেয়ে খেয়ে ওঠে, ছিন্ন ভিন্ন হতে থাকে তার জর্জরিত দেহটা এবং চক্ষের নিমিষে যেন অগুণতি সংখ্যায় একই চেহারায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। (*পুরুদ্রুজ*, পৃ. ৫৪৪)

গ্রামীণ জীবনে বেড়ে-ওঠা কেরামতের সহজ-সরল জীবনচর্যা, তার দেশাত্মবোধ ও সংগ্রামশীলতার চিত্রাঙ্কনে *পুরুদ্রুজ* সমৃদ্ধ। তার জীবন ও মনস্তত্ত্বের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে এদেশের নির্যাতিত অসংখ্য মানুষ।

পুরুদ্রুজ উপন্যাসে রিক্সাচালক কেরামতের প্রাণবিসর্জন প্রসঙ্গই এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়। এ ঘটনাংশের সঙ্গে স্মৃতিমন্থনসূত্রে যুক্ত হয়েছে গ্রামীণ পরিবেশে কেরামতের জীবন-জীবিকা, কেরামত-গুলশানের দাম্পত্য জীবন, গ্রামীণ রাজনীতি ও ষড়যন্ত্র, গুলশান ও তুবাবিবির মৃত্যুরহস্য প্রভৃতি। এ সমস্ত ঘটনা উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করলেও মূল ঘটনাংশকে তেমন প্রভাবিত করেনি। তদুপরি কেরামত ঢাকা শহরে কীভাবে উপস্থিত হয়েছে – এসব ঘটনাও উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উপস্থাপিত হয়নি।

এ উপন্যাসে নব্বই সালের গণআন্দোলন পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সে সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে ঢাকা শহরের নিম্নবিত্তশ্রেণির জীবন ও জীবিকা, অর্থলোভী দালালদের দৌরাত্ম্য এবং কেরামতের আত্মত্যাগ প্রসঙ্গ। 'নব্বই এর স্বৈরাচার বিরোধী গণআন্দোলনের পটভূমিতে রচিত এ-উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদা পেয়ে যায় কোনো দল বা দলীয় নেতা-নেত্রী নয়, গণমানুষের প্রতিভূ একজন রিক্সাশ্রমিক, বস্তিবাসী কেরামত।'[১]

কেরামত ছাড়া প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্র অপূর্ণ। ঘটনার প্রয়োজনেই গ্রামীণ ও শাহরিক চরিত্রসমূহ ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক। কেন্দ্রীয় চরিত্র কেরামতই এ উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের প্রাণ-উৎস। সরলতা, সংগ্রাম এবং দেশাত্মবোধ কেরামত চরিত্রটিকে করেছে

[১]ইলু ইলিয়াস, 'আলাউদ্দিন আল আজাদ এক বিরলপ্রজ সব্যসাচী সাহিত্যস্রষ্টা', শিকদার আবুল বাশার (সম্পা.), প্রাগুক্ত,পৃ. ২১০

স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। কেরামত সৎ, নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী ও সংগ্রামী এক চরিত্র। দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করেও কারও দ্বারস্থ হয়নি সে। জীবিকার উদ্দেশে কখনো মৌচাক ভেঙে মধু বিক্রি, কখনো গৃহভৃত্য, কখনো রিক্সাচালক প্রভৃতি পেশায় নিযুক্ত হয়েছে কেরামত। পিতা নিয়ামত আলীর সংসারে অভাব-অনটনের মধ্যে বসবাস করেও অসৎ উপায় অবলম্বন করার চেষ্টা করেনি সে। মুনিবের মেয়ে গুলশানের সঙ্গে বিবাহ এবং গার্মেন্টসকর্মী পঙ্খীর প্রতি হৃদয়িক সম্পর্ক কেরামত চরিত্রটিকে করেছে অধিকতর উজ্জ্বল।

কেরামতের পিতা কৃষক নিয়ামত আলী এক সাহসী চরিত্র। মা পান্নাবিবি তালুকদার বাড়িতে গৃহপরিচারিকা হিসেবে আশ্রয়প্রাপ্ত। তবে চরিত্র দুটি নির্মাণে লেখক তেমন মনোযোগী হননি।

নারী চরিত্রের মধ্যে অধিকতর উজ্জ্বল চরিত্র পঙ্খী। উপন্যাসে তার ভূমিকা প্রাণবন্ত। পঙ্খীই কেরামতের বুকে ও পিঠে লিখেছিল 'স্বৈরাচার নিপাক যাক্, গণতন্ত্র মুক্তি পাক'শ্লোগানটি। নারী চরিত্রের মধ্যে আমিরন বিবি, তুবাবিবি, আঙ্গুরী, পাঞ্জীবিবি প্রমুখ চরিত্র অনুজ্জ্বল।উপন্যাসে বেশ কয়েকটি চরিত্র খল রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। শরীফ মস্তান, হাশেম, আজমীর গুণ্ডা, কফিলউদ্দিন আহমদ, আকরাম প্রভৃতি চরিত্র প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে যুক্ত। বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের নামও প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে। যেমন: শেখ হাসিনা, বেগম খালেদা জিয়া, আসম রব প্রমুখ। মুসাপুর গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তি হাতেম আলী তালুকদার ও তার দ্বিতীয় স্ত্রী তুবাবিবি খলচরিত্র হিসেবে চিত্রিত হয়েছে উপন্যাসে। এছাড়া প্রান্তিক চরিত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ইসমত, সাব্বাশ মাষ্টার, পাহারাদার কুতুব ও টুন্ডা, মাস্টার মীর সিরাজুল প্রমুখ।

এ উপন্যাসের ঘটনাংশ ও চরিত্র চিত্রণে প্রধানত ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো কখনো কেরামত, পঙ্খী, পাঞ্জীবিবি, হাশেম, আজমীর, ইসমত, আঙ্গুরী প্রমুখ চরিত্রের দৃষ্টিকোণ ব্যবহারে ঘটনাংশে এসেছে লক্ষণীয় বৈচিত্র্য। স্মৃতিমন্থনসূত্রে অনেকগুলো খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা অতীত ও বর্তমানের সমন্বয়ে চিত্রিত হয়েছে; যেগুলো উপন্যাসের সাংগঠনিক কাঠামো দুর্বল করে তুলেছে।

উপন্যাসে কোনো কোনো এলাকায় আলাউদ্দিন আল আজাদ ব্যবহার করেছেন চেতনাপ্রবাহরীতি। এরকম একটি বর্ণনাংশ লক্ষণীয়:

> একটা বাঁশে হেলান দিয়ে, পা ছড়িয়ে বসে থাকে কেরামত বাকী রাতটুকু, কেন জানি পঙ্খীও তাকে একা রেখে চলে গেল না। ক্রমে ফজরের আযান শোনা যেতে লাগল এবং ভোরের আকাশ দিয়ে উড়ে যাওয়া পাখিদের পাখার ধুপ্‌ধুপ্‌ এখানকার গাছে গাছে কিচির মিচির। আবর্জনাময় বস্তিটা প্রাগৈতিহাসিক জউর মতো শেষরাতে নড়েচড়ে উঠেছিল। কোনো কোনো খুপড়িতে বাচ্চার কান্না শোনা যায়। এদিককার সরুপথে দু'তিনটা লোক হেঁটে গেল, বোধহয় ইসটিশনের দিকে। তেমনিভাবে বসে থেকেই, কেরামত তো ঘুমিয়েই পড়েছে। পঙ্খীর চোখও গভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন, ঢুলুঢুলু। মগ্নচেতনায় ... একটা লোক বলছিল, প্রত্যেক আন্দোলনই তো লাশ চায়। (*পুরুদ্রুজ*, পৃ. ৫৪৩)

আলাউদ্দিন আল আজাদ ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে এ উপন্যাসে উপমা-অলংকার নির্মাণ করেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়:

১. তোর শরীরটা দেখছি বডি বিল্ডারের মত শক্তিশালী! (*পুরুদ্রুজ*, পৃ. ৫০৪)
২. ডোবার উপরে বাঁশের খুটিতে বানানো যে আস্তানা, সেগুলো ডিঙিনৌকার ছইয়ের মতো। (*পুরুদ্রুজ*, পৃ. ৫০৬)
৩. কলফা লোকটা সহজ না। চালকুমড়ার মতন চেহারা। (*পুরুদ্রুজ*, পৃ. ৫১৩)
৪. আগে যাই ছিল এখন বকনা ষাঁড়ের মতন বেড়ে উঠেছে কেরা, উঠানের কাছে ওর গুণ্‌গুণ্‌ শোনা যায়। (*পুরুদ্রুজ*, পৃ. ৫২০)
৫. খঞ্জনা পাখির মতো চঞ্চল হয়ে ফেরে গুলশানের চোখ। (*পুরুদ্রুজ*, পৃ. ৫২৫)

উপন্যাসে ব্যবহৃত নিম্নোক্ত গানটি আবেগময় পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণ করেছে:

> তিলেক দাঁড়াও তোমায় দেখি হে নাগর,
> তিলেক দাঁড়ায়ও তোমায় দেখি।
> আঙুল কাটিয়া কলম বানাইয়া, নয়নের জলে করলাম কালি,
> লিখন লিখিয়া যতন করিয়া
> পাঠাইলাম শ্যামবন্ধুর বাড়ি, হে নাগর।
> তিলেক দাঁড়াও তোমায় দেখি। (*পুরুদ্রুজ*, পৃ. ৫২৬-৫২৭)

এ উপন্যাসে ভাষাভঙ্গি ব্যবহারে ঔপন্যাসিক কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। আঞ্চলিক ভাষাব্যবহারে তাঁর অবদান অসামান্য। উপন্যাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে পাত্র-পাত্রীদের মুখে আরোপিত আঞ্চলিক সংলাপ। বিশেষত গ্রামীণ মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কনে

আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গি উপন্যাসে নিয়ে এসেছে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা। কেরামত ও পঙ্খীর মা পাঞ্জবিবির কথোপকথন–

> আইছ বাবা কেরামত? পিড়িটা টাইন্যা বও। তুমারে ভাত দেই। পঙ্খীর আজগা ফিরতে দেরি অইবো। বস্ত্রমেলায় হেইর্ ডিউটি আছে। তাগো কোম্পানি ইসটল দিছে তো? বও, বও। (*পুরুদ্রুজ*, পৃ. ৫০৬)

পঙ্খী ও মা পাঞ্জীবিবির কথোপকথন –

> মাইন্ষের মুহে কি টাট্টি আছে। তুই গারমেন্টেসে কাম করস, দুইডা পইসা পাস– অনেকের এইড্যা সহ্যই অইতাছেনা। কত কথা কয়। তোরে নাহি ছিনাল ডাহে। কয়দিন পরে কইবো, নডী। (*পুরুদ্রুজ*, পৃ. ৫০৯)

আঞ্চলিক ভাষারীতির পাশাপাশি উপন্যাসে লোকজীবনে উচ্চারিত শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন: ছেমড়ি (মেয়ে), হাইনজাবেলা (সন্ধ্যা), হপন (স্বপ্ন), আজগা (আজ), আইট্যা (হাঁটা), হুনি (শুনি), চাহর (চাকর), হগল (সকল), কালকা (কাল) প্রভৃতি।

নব্বইয়ের স্বৈরাচারী পতন আন্দোলন ও নূর হোসেনের আত্মত্যাগকে বিষয় করে কোনো উপন্যাস অদ্যাবধি রচিত হয়নি। *পুরুদ্রুজ* তাই নিঃসন্দেহে আলাউদ্দিন আল আজাদের পৃথক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সৃষ্টিকর্ম।

প্রিয় প্রিন্স

প্রিয় প্রিন্স[১] (১৯৯৫) আলাউদ্দিন আল আজাদের রোমান্টিক ভাবানুষঙ্গবাহী জটিল মনস্তাত্ত্বিক মনস্তাত্ত্বিক প্রেমের উপন্যাস। উপন্যাসের নায়ক মাহবুব জামাল চৌধুরী প্রিন্সকে সম্বোধন করে পত্রাকারে ঘটনাংশ বর্ণিত হয়েছে এ উপন্যাসে। উপন্যাসের ১৫টি পরিচ্ছেদে মেহেরবা জেবিন খানম জুবির আত্মকথন ও আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের টুকরো টুকরো ঘটনা, নাগরিক মধ্যবিত্তের বিচিত্রজটিল জীবন, প্রেমসম্পর্কের দ্বন্দ্ব ও উত্তরণের অভীপ্সা অবিব্যক্ত হয়েছে। একই বাড়িতে অবস্থানরত দুই পরিবারের জীবনচিত্রণের পাশাপাশি প্রিন্স ও জুবির মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার রহস্যও উদঘাটিত

[১]আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'প্রিয় প্রিন্স', *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ২০০১, গতিধারা, ঢাকা। বর্তমান গ্রন্থে *প্রিয় প্রিন্স* উপন্যাসের পাঠ এ সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ঈদসংখ্যা *রোববারে* (১৯৯৫)।

হয়েছে এখানে। ঔপন্যাসিক কেবল মানুষের জীবনচিত্র উপস্থাপনেই মনোযোগী ছিলেন না, বরং জীবনের পরিণতিও দেখিয়েছেন সফলতার সঙ্গে।

প্রিয় প্রিন্স উপন্যাসের ঘটনাংশ উন্মোচিত হয়েছে মেহেরবা জেবিন খানম জুবি ও মাহবুব জামাল চৌধুরী প্রিন্সের প্রেমসম্পর্ককে উপলক্ষ করে। প্রিন্সের মা জাহানারা বেগম ভালোবেসেছিলেন মুক্তিযোদ্ধা আসগর আলী শাহকে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তাদের ভালোবাসার ফসল হিসেবে জাহানারার গর্ভে বেড়ে ওঠে প্রিন্স। ঘটনাক্রমে আসগরের বোন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে তারই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্যবসায়ী মনোয়ার কামাল চৌধুরীর সঙ্গে সম্পর্কিত হয় জাহানারা; যাতে গর্ভস্থ সন্তানের পরিচয় নিয়ে সামাজিক জটিলতা তৈরি না হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার নাম রাখা হয় প্রিন্স। জাহানারার ডায়েরিতে লেখা প্রিন্সের নামকরণ সম্পর্কে যে বাস্তব সত্য অঙ্কিত হয়েছে তার প্রাসঙ্গিক অংশ লক্ষণীয়:

> আমাকে একলা পেয়ে বললেন: মণিমালা। তুমি তো জানো আমি এক দ্বৈতসত্তা– মনোয়ার ও আসগরের সম্বন্বয়। বাচ্চাটিও তাই হোক। অন্তত নামে তো প্রথম। ওর ডাকনাম রাখলাম প্রিন্স। আসগর আলী শাহ, শাহ থেকে শাহজাদা। প্রিন্স শাহাজাদার ইংরেজি ভার্সন এবং ওর আনুষ্ঠানিক নাম হোক আমার নামের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাহবুব জামাল চৌধুরী। (*প্রিয় প্রিন্স*, পৃ. ৬০৭)

বড় হয়ে প্রিন্স জেনেছে তার জন্মবৃত্তান্ত। অতঃপর প্রতিমুহূর্তে সে হীনমন্যতাবোধে কাতর হয়েছে। মনোজগতে হয়ে পড়েছে দুর্বল ও নিঃসঙ্গ। কোথাও সে সঞ্চারিত করতে পারেনি তার অস্তিত্বের শিকড়। ফলে তার আচার-আচরণ-উচ্চারণে সর্বদাই পরিলক্ষিত হয়েছে বিকারগ্রস্ততা ও অন্তর্যন্ত্রণা। সে বিকারগ্রস্তের মতো মাকে প্রশ্ন করেছে এভাবে:

> মা! ওটা তোমার ভরা যৌবনকাল ছিল। যৌবনকাল তো ঘৃণারও কাল। কিন্তু তখন কেন তুমি এত মহৎ ছিলে! কেন তুমি পাষাণী হতে পারলে না, পারলে না ডাকিনী হতে ? কেন কেন জবাব দাও। একটা অবৈধ ভ্রূণ নষ্ট করে ফেলা কি এতই কঠিন ছিল তোমার জন্য? যদি করতে, তাহলে তো আমি এই পৃথিবীর মুখ দেখতাম না। অন্যেও দেখত না আমার মুখ। (*প্রিয় প্রিন্স*, পৃ. ৬০০)

কোনো মায়ের কাছেই গর্ভের সন্তান অবৈধ হতে পারে না। তাই তো মা জাহানারা বেগম পুত্র প্রিন্সকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

> তুই অবৈধ নস্, তুই প্রেমের ফসল, দশমাস দশদিন তোকে আমি পেটে ধরেছি, তুই আমার সন্তান। তোর বাবা এক অগ্নিপুরুষ। (*প্রিয় প্রিন্স*, পৃ. ৬০০)

জাহানারা বেগমের আবেগপূর্ণ উচ্চারণেও বিভ্রান্ত হয় প্রিন্স। তার জীবন ক্রমশই একাকিত্বের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে থাকে। জন্মের অপবাদ তার জীবনকে সাংঘাতিকভাবে বিপর্যস্ত করে দেয়। তার প্রাত্যহিক জীবনাচরণ হয়ে পড়ে ভারসাম্যহীন:

> তুমি বাঁচবে না মা, আমিও তো মরছি। আমি মরে যাবো। আমি মরে যাবো, কিন্তু তোমাদের কাউকে জীবিত রাখবো না। না, না। (*প্রিয় প্রিন্স*,পৃ. ৬১৬)

একদিকে প্রিন্স অন্যদিকে উপন্যাসের নায়িকা মেহেরবা জেবিন খানম জুবির মনোজগতেও তোলপাড় তোলে তার জন্মবিষয়ক জটিল প্রসঙ্গ। তার বাবা মুক্তিযুদ্ধের সময় শহীদ হয়েছিলেন। সেই সময় মা হুমায়রা সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা। মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে পাক হানাদার বাহিনী ধরে নিয়ে যায় হুমায়রাকে। কিন্তু এক সিপাহি তাকে আলাদা করে নিয়ে যায় ভিন্ন স্থানে, এবং তার ওপর চালায় পাশবিক নির্যাতন। পাক হানাদার বাহিনীর নির্যাতন ও নিপীড়নের বর্ণনা ঔপন্যাসিক অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ভঙ্গিতে এ উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। প্রাসঙ্গিক অংশ লক্ষণীয়:

> একাত্তরের মাঝামাঝি। ... দখলদার বাহিনীও এদিকে অগ্রসর হয়ে আসে, পশ্চাৎ প্রতিরক্ষা ব্যূহ হিসেবে। ... সেই ভিত্তিতে আশেপাশের তিনটি গ্রামে হানা দেয় ওরা, রাতের বেলায়, চালায় নির্বিচার অগ্নিসংযোগ, হত্যাকাণ্ড। প্রথম ব্লক দেয়ার সময়েই ঋষিপুর থেকে এগারোটি মেয়ে ধরে এনেছিল। বিদ্যালয় ভবনের কয়েকটি কক্ষে বেঁধে রাখে ওদের, পালা করে জুলুম চালায়। (*প্রিয় প্রিন্স*, পৃ. ৬১৩-৬১৪)

হুমায়রার অভিজ্ঞতা এ-প্রসঙ্গে লক্ষণীয়:

> আমাকে যে দখল করে সে অন্যদের আমার কাছে ঘেঁষতে দিত না। ... সেপাইটা আমাকেও নিয়ে গেল। খাদের ভিতরে মোটা কাঠের খুঁটি। দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে। সে যখন খায়, টুকরো রুটি দেয়

> আমাকেও। সারাক্ষণ রাইফেল উঁচিয়ে আছে। যখন যা ইচ্ছে হয়, তাই করে আমার উপর । বাধা দিলে ঝকঝকে ধারালো ছুরিটা ঢুকিয়ে দিতে চায় পেটের মধ্যে। (*প্রিয় প্রিন্স*, পৃ. ৬১৪)

এই পাশবিক নির্যাতনের বৃত্তান্ত গ্রামবাসী জেনে ফেলার কারণে নিজ বাড়িতে আর অবস্থান করেননি হুমায়রা। শেষ পর্যন্ত আত্মীয় জাহানারা বেগমের ঢাকার বাড়িতে আশ্রয় নেন তিনি।

উপন্যাসে জাহানারা বেগম এবং হুমায়রা মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যে বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তারই প্রতিক্রিয়া এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে নিক্ষেপ করে প্রিন্স ও জুবিকে। বাইশ বছর যে বাড়িতে তারা সুখে-দুঃখে বেড়ে ওঠেছিল, সে-বাড়িতেই জন্মসত্যের তথ্য অবগত হয়ে বড়োবেশি বেদনাকাতর। এ বেদনাময় সংকট কিন্তু শেষাবধি তাদের নিয়তি হয়ে দাঁড়ায়নি। তাই উপন্যাসের অন্তিম পর্যায়ে দেখা হয়, সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে জুবি ও প্রিন্স বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। জটিল মনস্তাত্ত্বিক সংকট থেকে উত্তীর্ণ হয়ে তারা সুস্থজীবনের অভিযাত্রিক।

প্রিয় প্রিন্স উপন্যাসের উপকরণ একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা-উত্তর ঘটনাপ্রবাহ। মুক্তিযুদ্ধের বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং জুবি-প্রিন্সের বিবাহপূর্ব মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও দ্বন্দ্বের অবসান প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে পত্রাকারে রচিত এ উপন্যাসে।

প্রিয় প্রিন্স উপন্যাসে আলাউদ্দিন আল আজাদ জুবির সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকোণের সঙ্গে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে ঘটনা ও চরিত্রসমূহকে করে তুলেছেন পরিণামমুখী। পত্রোপন্যাসে বিন্যস্ত জুবির আত্মোপলব্ধি ও দৃষ্টিকোণ *প্রিয় প্রিন্স* এর শিল্পরীতিকে করেছে অভিনব ও স্বতন্ত্র।

এ উপন্যাসে চরিত্রের সংখ্যা স্বল্প। আলাউদ্দিন আল আজাদ ঘটনা-বিস্তারের প্রতি যতটুকু মনোযোগী ছিলেন, চরিত্রের বিকাশ ও পরিণতির প্রতি ঠিক ততটুকু মনোযোগী ছিলেন না। জুবি, প্রিন্স, হুমায়রা, জাহানারা, মনোয়ার কামাল চৌধুরী ব্যতীত অন্যান্য চরিত্র তেমন বিকশিত হয়ে ওঠেনি। প্রিন্স ও জুবি নিজেদের জন্মবিষয়ে প্রশ্নবিদ্ধ ও দ্বিধান্বিত হলেও শেষ পর্যন্ত সুস্থ জীবনে প্রবেশ করেছিল। হোমায়রা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী হিসেবে কর্মব্যস্ত। তাছাড়া একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের বীরাঙ্গনা নারীর মূর্ত প্রতীক তিনি। জাহানারা তাঁর প্রেম ও বিবাহ প্রসঙ্গে সাময়িকভাবে বিচলিত হলেও ধৈর্য হারাননি। জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে সামনে এগিয়ে গেছেন তিনি। ছিন্নমূল নারীদের এক পুনর্বাসন সংস্থায় কর্মব্যস্ত জাহানারা। ব্যবসায়ী মনোয়ার কামাল চৌধুরী বাস্তববাদী, ধৈর্যশীল, কর্তব্য-পরায়ণ, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় জাগ্রত চরিত্র। মোল্লা ও প্রিয়া চরিত্র অবিকশিত ও নিষ্প্রভ। সংকটদীর্ণ জুবির দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হওয়ায় এ উপন্যাসের বর্ণনা প্রায়ই হয়ে উঠেছে বিষাদময় ও গীতময়। যেমন:

> আমার যৌবন, তোমার যৌবন। কাছাকাছি ছিল, ছিল পাশাপাশি। কখনো মিলেছে, কখনো চলেছে সুদূরে; কিন্তু তবু ছিল একসঙ্গে জোয়ার ভাঁটার মতো। এখন আমাকে চিরতরে ছাড়বে তুমি যখন জেনে যাবে আমার জীবনের ইতিবৃত্ত। তোমারটা নিষ্ঠুর, কিন্তু আমারটা নিঃশেষ। অথচ বেঁধেই তো রেখেছ তুমি আমাকে। অনন্তে আমি ঝুলছি, যেন একটি আঁধার তারকা। তাই হয়তো এই নির্জন মুহূর্তেও ভুলতে পারছিনা একটি শ্রাবণ দিন। একটি শ্রাবণ রাত। (*প্রিয় প্রিন্স*, পৃ. ৬০৮)

আলাউদ্দিন আল আজাদ চরিত্রসমূহের জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে এ উপন্যাসে উপমা-অলংকার ব্যবহার করেছেন। এতৎপ্রসঙ্গে কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়:

১.ছোটবেলার তো বটেই, বিশেষত কৈশোরের স্মৃতি এখনো ঝাপটা মারে, দমকা বাতাসের মতো, ... (*প্রিয় প্রিন্স*, পৃ. ৫৯২)

২. কেবল তোমার সুখের হাওয়ায় পাখনা মেলে প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াবো, এটা হতে পারে না। (*প্রিয় প্রিন্স*, পৃ. ৫৯৩)

৩. রাস্তায় একটা না একটা দুর্ঘটনা তো ঘটছেই, কিন্তু তোমার ড্রাইভিং রেশমের মতোই মসৃণ। (*প্রিয় প্রিন্স*, পৃ. ৫৯৬)

৪. অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবো নাকি মৃগী রোগীর মতো? (*প্রিয় প্রিন্স*, পৃ. ৬১৩)

৫. তখন মনের ভিতরে কালোস্রোতের মতো চলেছে আমার ইতি কাহিনী। (*প্রিয় প্রিন্স*, পৃ. ৬১৩)

মুক্তিযুদ্ধের বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলি ও মধ্যবিত্তের জীবন চিত্রায়ণে উপন্যাসে চলিত গদ্যরীতি অনুসৃত হয়েছে। এর ভাষা প্রাঞ্জল ও সাবলীল। শব্দচয়ন, বাক্যগঠন এবং নিসর্গচিত্র উপন্যাসকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছে।

আলাউদ্দিন আল আজাদ শিল্পদৃষ্টিতে ইতিবাচক ও রোমান্টিক। সে বিশ্বাসই রূপায়িত করেছেন *প্রিয় প্রিন্স* উপন্যাসে। জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বময় জটিল মুহূর্তগুলোকে পাশ কাটিয়ে প্রিন্স-জুবি কীভাবে ইতিবাচক জীবনবোধে আন্দোলিত হয়েছে তা ঔপন্যাসিক সার্থকতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন এ উপন্যাসে।

কালোজ্যোৎস্নায় চন্দ্রমল্লিকা

আলাউদ্দিন আল আজাদের *কালোজ্যোৎস্নায় চন্দ্রমল্লিকা*[১] (১৯৯৫) উপন্যাসটি নাগরিক জীবনের পটভূমিকায় বিম্বিত। স্বল্প পরিসরের এই উপন্যাসটিতে উপস্থাপিত হয়েছে উচ্চবিত্ত শ্রেণির জীবনচিত্র, মানসিক যন্ত্রণা, প্রেম, প্রতারণা ও আত্মদ্বন্দ্ব প্রভৃতি।

এই উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ খুবই সংক্ষিপ্ত। পাশাপাশি বাড়িতে বসবাসরত দুই উচ্চবিত্ত পরিবার– একটি পরিবার আবুল হায়াতের, অন্যটি আবুল কাশেমের। তারা দুজনেই পরস্পরের ঘনিষ্ঠ। অসদুপায়ে অর্থোপার্জন করে তারা একসঙ্গে জমি ও বাড়ি তৈরি করেছেন। আবুল কাশেমের কন্যা কান্তা ছিল আবুল হায়াতের ছোট মেয়ে লুবনা জাহান চন্দ্রার বন্ধু। কিন্তু ঘটনাক্রমে আবুল কাশেমের কন্যাকে মৃত ও বিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়

[১] আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'কালোজ্যোৎস্নায় চন্দ্রমল্লিকা',*স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, প্রথম প্রকাশ, ২০০০, গতিধারা, ঢাকা। বর্তমান গ্রন্থে *কালোজ্যোৎস্নায় চন্দ্রমল্লিকা* উপন্যাসের পাঠ এ সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় *সচিত্র বাংলাদেশ* ঈদসংখ্যায় (১৯৯৫)।

সাভারের এক সবুজ বৃক্ষতলে, ঘাসের ওপর। হত্যাকাণ্ডের প্রাসঙ্গিক বর্ণনা ঔপন্যাসিক দিয়েছেন এভাবে–

> একটি পুরোদিনের অর্ধেকটা, একটা পুরোরাত এবং তার পরের দিন, বেলা বারোটা পর্যন্ত। অনেক অফিসে ছুটোছুটি, অনেক অনুসন্ধান। অগুণতি ফোনকল। অবশেষে কান্তাকে, অবশ্য তার লাশটা, পাওয়া গিয়েছিল সাভারের একটি সবুজ বৃক্ষতলে, ঘাসের উপর। ... লাল-লাল, রক্তাক্ত কাপড়ে ঢাকা ছিল। ... বুক ওর ছুরিবিদ্ধ, পেটের নানা অংশও; কিন্তু সবচাইতে নৃশংস চোখের তলায় গালে নাকি গলায়ও অস্ত্র চালিয়েছে ! (*কালোজ্যোৎস্নায় চন্দ্রমল্লিকা*, পৃ. ২৮৩)

কান্তার বিকৃত লাশ দেখে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে চন্দ্রা। চন্দ্রার মা খাদিজা, বাবা আবুল হায়াত মেয়ের দুরবস্থা নিয়ে চিন্তিত। একদিকে কাশেমের পরিবারে চলছে শোকের মাতম, অন্যদিকে আবুল হায়াতের পরিবারটি চন্দ্রার মানসিক দুরবস্থায় কাতর। কান্তাকে হত্যার অভিযোগে তার বন্ধু জহির জামিলকে থানায় বন্দি করা হয়। কিন্তু জামিল এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আদৌ সম্পৃক্ত কিনা সে ধরনের কোনো ইঙ্গিত উপন্যাসে অনুপস্থিত। উপন্যাসের এক পর্যায়ে আবুল কাশেম বন্ধু আবুল হায়াতের বাড়িতে এসে মেয়ের এই হত্যাকাণ্ডের জন্য নিজেকে দায়ী বলে মনে করেন। তাঁর বক্তব্য–

> ... আবুল, আবুল! কাল আমাকে আদালতে নিয়ো চলো ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে, আমি জুডিসিয়াল স্টেটমেন্ট দেবো। আমি খুন করেছি আমার মেয়েকে, আমিই খুন করেছি! (*কালোজ্যোৎস্নায় চন্দ্রমল্লিকা*, পৃ. ২৯৪)

উপন্যাসের অন্তিম পর্যায়ে দেখা যায়, চন্দ্রার অস্বাভাবিক আচরণে বাড়ির সবাই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা-কবলিত। মগ্নচৈতন্যে কান্তার প্রতিমূর্তি দেখে অসংলগ্ন চন্দ্রা।

এই উপন্যাসের মূল ঘটনাংশ চন্দ্রার জীবনকেন্দ্রিক। কান্তার অস্বাভাবিক মৃত্যু চন্দ্রাকে প্রভাবিত করে। কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের কোনো ইঙ্গিত ঔপন্যাসিক দেননি। মূলত নগরজীবনে উচ্চবিত্তের জটিল জীবনচিত্র দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল ঔপন্যাসিকের।

ছয় পরিচ্ছেদের এই ক্ষুদ্রায়তনিক উপন্যাসে আবুল হায়াত ও আবুল কাশেম কীভাবে অর্থবিত্তের মালিক হলেন, কান্তাকে কেন হত্যা করা হলো, সাজ্জাদের লোক কেন আবুল কাশেমকে খুঁজছে, জামিলকে কান্তা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কেন সম্পৃক্ত করা হলো এসব থেকে গেছে অমীমাংসিত।

উপন্যাসে চরিত্রসংখ্যা স্বল্প। গৃহবধূ খাদিজা খাতুন, গৃহপরিচারিকা দারচিনি, হাসিনা বেগম, শাশা, আবুল হোসেন দিশা, চান্দু, মিশা, সাজ্জাদ জহির, প্রান্ত, আহমেদ খুরশিদ খান প্রভৃতি চরিত্র তেমন বিকশিত হয়ে ওঠেনি।

এ উপন্যাসের ঘটনাংশ ও চরিত্র চিত্রণে প্রধানত ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো কখনো আবুল হায়াত, আবুল কাশেম, খাদিজা খাতুন, চন্দ্রা প্রমুখ চরিত্রের দৃষ্টিকোণে ঘটনাংশ বিন্যস্ত করেছেন ঔপন্যাসিক।

সর্বোপরি, প্রকরণশৈলী বিচারে এ উপন্যাসটি অনুজ্জ্বল। ঔপন্যাসিক কেবল ঘটনা উপস্থাপনেই মনোযোগী ছিলেন, চরিত্রসমূহের গভীর জীবনবোধ ও শিল্পকর্ম নির্মাণে ততটা আন্তরিক ছিলেন বলে মনে হয় না।

বিপরীত নারী

আলাউদ্দিন আল আজাদের *বিপরীত নারী*[১] (১৯৯৫) স্বল্প পরিসরের একটি উপন্যাস। এটির রচনাকাল ১৯৯৫ সাল। উপন্যাসে স্বাধীনতা-উত্তর সময়ের বিবিধ প্রসঙ্গ বিন্যস্ত করেছেন ঔপন্যাসিক। নাগরিক জীবনধারা, উচ্চমধ্যবিত্তের আচার-আচরণ, দাম্পত্য জীবনের সংকট, আধুনিক নগরসংস্কৃতি, নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা, সংসার জীবন, ইন্টারভিউ প্রসঙ্গ, নারী দিবস, রোমান্টিকতা প্রভৃতি প্রসঙ্গ উপন্যাসটির বিষয়মূলে থেকেছে সক্রিয়।

মোহাম্মদ আকরাম-রাহনুমা দাম্পত্যধর্মে সম্পর্কিত থাকা সত্ত্বেও তাদের সময় কাটে নৈঃসঙ্গ্য অবস্থায়। আকরাম ব্যস্ত থাকেন অফিসের কাজ-কর্ম নিয়ে; অন্যদিকে রাহনুমার সময় কাটে ক্লাবে। নারীদের অধিকার ও স্বাধীনতা বিষয়ক বিচিত্র কর্মসূচি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তারা দুজনেই সংসার বিচ্ছিন্ন; তাদের দুই পুত্র-কন্যা থেকেও নেই। দুজনই অবস্থান করে দেশের বাইরে। এমতাবস্থায় আকরাম-রাহনুমার অবস্থান দুই বিপরীত মেরুতে। মোহাম্মদ আকরাম নিউ ওয়ার্ল্ড লিংক আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের একজন ম্যানেজার। উচ্চশিক্ষা

[১]আলাউদ্দিন আল আজাদ, '*বিপরীত নারী*', *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০০, গতিধারা, ঢাকা। বর্তমান গ্রন্থে *বিপরীত নারী* উপন্যাসের পাঠ এ সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ঈদসংখ্যা অঙ্গীকার (১৯৯৫)।

গ্রহণ না করলেও কষ্টেসৃষ্টে নিজের চেষ্টায় তিনি এতদূর এগিয়ে এসেছেন। দাম্পত্যজীবনের এ-পর্যায়ে অফিসে বিভিন্ন পদে নিয়োগদানকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত হয় নানান ঘটনা। বিশেষত জনসংযোগ অফিসার পদে তাহমিনা শারমিন নাম্নী যে পদপ্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিল, সে আসলে রাহনুমা কর্তৃক প্রেরিত একজন নারী। তাকে স্বামীর অফিসে নিয়োগদানের কারণ স্বামী-সম্পর্কিত নানা তথ্য অবগত হওয়া। শেষ পর্যন্ত আকরাম জানতে পারে স্ত্রী রাহনুমার এ-পরিকল্পনার কথা। একদিন আকরাম অফিস থেকে বাসায় ফিরে দেখলেন স্বামীর উদ্দেশ্যে একটি পত্র রেখে রাহনুমা উধাও। পত্রের অংশবিশেষ এরকম–

> আমি চললাম। হয়তো ভেবেছিলে কথার কথা। কিন্তু দেখলে তো প্রত্যেক রমণীর অন্তরেই পাথর আছে, সে পাথর ইতিহাস; এবং আমিও তাদের একজন। তোমাকে চিনি আমি, তুমি সচ্চরিত্র। কোমল চৌর্যবৃত্তির দিকে প্রত্যেক পুরুষের দুর্বলতা থাকে, এটা তাদের বৈশিষ্ট্য। তুমি তা থেকে মুক্ত, তা বলবো না; কারণ তা অবাস্তব। লিসার সঙ্গে ফস্টিনষ্টি করছো, আমি বিশ্বাস করি না, তবু একটু আলোড়ন তুললাম, নিজের জন্য। তুমি আমাকে ভালোবাসো, এটা ঠিক, কিন্তু এই ভালোবাসা আদরের মতো, সোহাগের মতো। এর মধ্যে হীরার দীপ্তি কোথায়, আগুন কোথায়? এজন্য তুমি দোষী নও।এটা প্রকৃতি, এটাই নিয়ম।প্রেম আসে, কিছুকাল থাকে; তারপর চলে যায়। প্রেম চলে গেলে কি থাকে নারীর অবশিষ্ট? এটাই জিজ্ঞাসা। কেউ বলে ব্যক্তিত্ব, কেউ স্বাধীনতা, আমি আমার স্বাধীনতাকে আবিষ্কার করে নিতে চাই। আমি দেখতে চাই, স্বাধীনতার মধ্যে কি আছে। (*বিপরীত নারী*, পৃ. ৩০৮)

স্ত্রীর চিঠি পড়ে বিমর্ষ হয়ে পড়েন আকরাম। শেষ পর্যন্ত নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তিনি ছুটে যান বন্ধু আসিফ জোয়ারদারের বাসায়; ধাতস্থ হবার চেষ্টা করেন এবং প্রতিদিনের মতো অফিসে যাতায়াত করতে থাকেন তিনি। ব্যস্ত সময় কাটে অফিসে।

উপন্যাসের অন্তিম পর্যায়ে দেখা যায়, অফিসেও দুর্ভাবনার মধ্য দিয়ে সময় কাটে আকরামের। অফিসের স্টেনোগ্রাফার লিসার মধ্যে দিয়ে আকরাম দেখতে পান প্রিয়কন্যা রাহীকে। অনেকটা ভাবালুতার মধ্য দিয়ে শয়নকক্ষে মেকআপ করা তাহমিনা শারমিনের অবস্থান দেখতে পান তিনি। কিন্তু সেই শারমিন ছিল আসলে রাহনুমাই। এতৎপ্রসঙ্গে লক্ষণীয়:

> তাঁর নাসিকা ধরে এপাশ-ওপাশ ঘোরাতে বলল, স্যার! অন্ধ হয়ে গেছেন! ডাক্তার মুস্তাফিজকে চোখ দেখান! ... আঁৎকে উঠলেন, দেখলেন, রাহনুমা! মিটিমিটি হেসে রাহু বললেন, শারমিনের মেকআপটা কাজের জন্য আদর্শ, আমাকে সে-ই এরকম বানিয়েছে, সে আমার অফিস সেক্রেটারি হচ্ছে। (বিপরীত নারী, পৃ. ৩১০)

শেষ পর্যন্ত আকরাম-রাহনুমার পুনর্মিলনের মধ্যদিয়ে সম্পন্ন হয় উপন্যাসের কাহিনি। রাহনুমার বক্তব্য এ-প্রসঙ্গে লক্ষণীয়:

> গভীর রাতে লেপের ভিতরে বুকে জড়িয়ে রাহু আকরামের কানে কানে তন্দ্রাজনিত স্বরে বললেন, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। কিছু অভিমান ছিল, বাকীটা আমার অভিনয়! (*বিপরীত নারী*, পৃ. ৩১০)

বিপরীত নারী উপন্যাসের কাহিনি বিন্যস্ত হয়েছে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে। উপন্যাসটি মূলত বিবরণধর্মী এবং এর উপস্থাপনরীতিও আধুনিক। ব্যক্তির আচার-আচরণ-উচ্চারণ, প্রেম, বিশ্বাস, রোমান্টিকতা প্রভৃতি প্রকাশে ঔপন্যাসিকের ভাষা পরিশীলিত ও গতিময়। উপন্যাসের গঠনকৌশলে ত্রুটি থাকলেও ভাষারীতিতে কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্পষ্ট।

ক্যাম্পাস

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের আর্থিক সমস্যা, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা ও আমলাতান্ত্রিক সমস্যা, প্রেম, নৈতিক অধঃপতন, চিকিৎসা ব্যবস্থায় দুর্নীতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রভৃতি দিক ব্যক্ত হয়েছে আলাউদ্দিন আল আজাদের *ক্যাম্পাস*[১] (১৯৯৬) উপন্যাসে। সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনের অস্থির চালচিত্রও এ উপন্যাসে প্রতিফলিত।

উপন্যাসের মূল চরিত্র হাসান আহমদ স্বপনের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের মেধাবী ছাত্র স্বপন। খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ওয়াসেক আহমদের সংসারে অর্থনৈতিক টানাপড়েনের কারণে স্বপন ফাইনাল পরীক্ষার ফি দিতে পারছে না। বাবা ওয়াসেকের স্বপ্ন ছিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের পর স্বপনকে আমেরিকায় পাঠাবেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থিরতা, সেশনজট ও আর্থিক সংকটে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় তার স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা। উপন্যাসের একপর্যায়ে দেখা যায়, পুত্রের পরীক্ষার ফি সংগ্রহের জন্য ওয়াসেক

[১] আলাউদ্দিন আল আজাদ, *ক্যাম্পাস*, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৬, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা। বর্তমান গ্রন্থে *ক্যাম্পাস* উপন্যাসের পাঠ এ সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে। এটি 'রুদ্ধশ্বাস বসবাস' নামে প্রথম প্রকাশিত হয় পাক্ষিক *পালাবদল* পত্রিকার ঈদসংখ্যায় (১৯৯৪)।

আহমেদ দ্বারস্থ হয়েছেন প্রিয় শিষ্যদের কাছে; কিন্তু ব্যর্থ হয়ে বাড়ির জমি বিক্রির কথা ভাবছেন তিনি। অবশেষে নিরুপায় হয়ে স্ত্রী মনোয়ারের বালা জোড়া বিক্রি করে স্বপনের পরীক্ষার ফি সংগ্রহ করতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু সেই আশাও ধূলিসাৎ হয়ে গেছে বড় ছেলে নিশানের কারণে। উচ্ছৃঙ্খল নিশান চুরি করে মার বালা বিক্রি করে দিয়েছে। এমতাবস্থায় নিশানের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের পর্যায়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন ওয়াসেক। পুত্র নিশানকে থানা-পুলিশের ভয় দেখিয়েও ব্যর্থ হন তিনি। পিতার অর্থনৈতিক টানাপড়েনের সময় নিশান তাঁর প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়নি বরং প্রদর্শন করেছে দুর্বিনীত আচরণ। পিতা-পুত্রের কথোপকথন এ-প্রসঙ্গে লক্ষণীয়:

> 'খবরদার বাবা!' নিশানের আশ্চর্য গলা, বলিষ্ঠ ও বেপরোয়া। সে বলল, 'তুমি আমার পিতা। তাই সাবধান করছি।' অগ্নিচক্ষুতে তাকিয়ে ওয়াসেক বললেন, 'আমাকে সাবধান করছিস, তুই ? কাপুরুষ ডাকাত, দুশ্চরিত্র শয়তান!' নিশান বলল, 'আমি এ সমস্তই, তবু সাবধান করছি। আমাকে যদি থানায় দাও, তাহলে শোনো বাবা, আমি তোমার নামে দুর্নীতির কেস দেয়ার ব্যবস্থা করবো! (*ক্যাম্পাস*, পৃ. ৪০)

বাবা ওয়াসেকের হাসপাতালের ভর্তি হবার কথা স্বপন শুনতে পায় লিজার কাছে। বাবার দুর্দিনে উদভ্রান্ত হয়ে সাহায্যের জন্য সে ছুটে যায় ছাত্রনেতা মুশতাকের কাছে। কিন্তু মুশতাকের দেয়া অবৈধ অর্থ স্বপন গ্রহণ করলেও ছোটবোন শ্রাবণী সে অর্থ প্রত্যাখ্যান করে। শ্রাবণীর কাছ থেকে অপমানিত হওয়ার পর স্বপন প্রবেশ করে একটি খাবারের দোকানে। সেখানে তাকে পরিকল্পিতভাবে নেশাতুর করে ফেলে মুশতাক বাহিনী। রাত্রি অতিবাহিত হবার পর সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠে সে, এবং মুশতাকের কাছ থেকে নেয়া অর্থ ফেরত দিতে চায়। অতঃপর স্বপন হাসপাতালে প্রবেশের পর একজন তরুণ আবু রায়হান ওয়াসেকের চিকিৎসা সম্পর্কে অবহিত করেন পত্রিকার শিরোনামের মাধ্যমে।

একজন অসুস্থ শ্রমিক নেতাকে দেখতে পি.এম. গিয়েছিলেন হাসপাতালে। প্রত্যাগমনের সময়ে পাশের বেডের রোগী সম্পর্কে অবহিত হন তিনি; এবং তাৎক্ষনিকভাবে ওয়াসেকের জন্যে ভিআইপি কেবিনের ব্যবস্থা করেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি বলেন:

> শিক্ষকরাই জাতির স্থপতি, সেজন্য শিক্ষার উপরে আমরা এত গুরুত্ব আরোপ করেছি। তাঁদের সুযোগ সুবিধা আমরা আরও অনেক বাড়িয়ে দেবো। কিন্তু তাকে এখানে ফেলে রেখেছেন কেন ? ভিআইপি কেবিন নেই? (*ক্যাম্পাস*, পৃ. ৫৪)

কিন্তু অকস্মাৎ একজন কেন্দ্রীয় নেতা অসুস্থ য়ে পড়লে ওয়াসেক আহমদ স্থানন্তিরিত হন ভিআইপি কেবিন থেকে নিজ গৃহে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার অবস্থার কথা ভাবারও চেষ্টা করেনি। অর্থ ও ক্ষমতার কাছে হাসপাতালের প্রশাসনও যে জিম্মি– সেই দিকও তুলে ধরেছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ।

উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে দেখা যায়, স্বৈরাচার পতনদিবসে ছাত্ররা হরতাল ডেকেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ধরনের থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। এদিকে ছাত্রনেতা মুশতাক আন্দোলনের নামে পরিকল্পিতভাবে স্বৈরাচার পতন দিবসে স্বপনকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। কিন্তু সেই ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। বাইরে টেলিগ্রামে স্বপনের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হলেও বাস্তবে তা ঘটেনি। উপন্যাসে দেখা যায়:

> এসময় একটা দ্রুতগামী বাস এসে শ্যামলীর কাছে থামল। উসকোখুসকো, স্বপনকে ধরে নেয়ে নামলেন আবদুর রাহমান। মা ও অন্যদের দেখতে পেয়ে ছুটে যায় কাছে স্বপন! মা'কে জড়িয়ে ধরে আকুলভাবে বলল, 'মা! মা! এই যে আমি স্বপন! ওরা আমাকে মারতে পারেনি!' (*ক্যাম্পাস*, পৃ. ৬১)

ক্যাম্পাস উপন্যাসে কাহিনি পরিকল্পনায় আলাউদ্দিন আল আজাদ সমকালীন বাস্তবতা তথা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের করুণ কাহিনি উপস্থাপনের পাশাপাশি নাগরিক জীবনের বাস্তবতা ও রাজনীতি প্রকাশ করেছেন দৃঢ়তার সঙ্গে। সমকালীন রাজনীতি ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনবাস্তবতা উপস্থাপনায় উপন্যাসটি অনেকটা ব্যতিক্রমধর্মী। আলাউদ্দিন আল আজাদ স্বাধীনতা-উত্তর সময়ের নিম্নবিত্তের করুণ জীবনচিত্রই শুধু অঙ্কিত করেননি, তাদের পরিণতির দিকও উপস্থাপন করেছেন।

ক্যাম্পাসে চরিত্রসংখ্যা স্বল্প। কেন্দ্রীয় চরিত্র হাসান আহমদ স্বপন এ উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের প্রাণ। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আদর্শনিষ্ঠা এ-চরিত্রটিকে করে তুলেছে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। ওয়াসেক আহমদের সংগ্রামশীল জীবন হয়ে উঠেছে এদেশের সংগ্রামশীল মানুষের আদর্শস্থানীয়। নিশানের বেকার জীবন ও নৈতিক অবক্ষয়, শ্রাবণীর দৃঢ়তা, মনোয়ার বেগমের বাস্তবধর্মী চিন্তা-চেতনা সমকালীন বাংলাদেশের চালচিত্রকেই করে তুলেছে স্পষ্ট। আর্থিক দুর্দশা ও প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ওয়াসেকের মন ও মনন থেকে মুছে যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আবদুর রহমানের চরিত্রও যথেষ্ট যুগোপযোগী।

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসে লক্ষণীয়, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ওয়াসেক আহমদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আশফাক ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তার ঊর্ধ্বে থেকে সমাজের কল্যাণ কামনা করেছেন। ওয়াসেক আহমদ শেষ পর্যন্ত অন্যায়ের সঙ্গে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করেছেন। অন্যদিকে আশফাক বিশ্ববিদ্যালয়ের নোংরা রাজনীতি থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সপরিবারে চলে যান বিদেশে।

নিশানের স্ত্রী পামেলার অন্তর্যন্ত্রণা ব্যক্ত হয়েছে উপন্যাসে। মুশতাক, মিনহাজ চরিত্রগুলি তেমন বিকশিত হয়ে ওঠেনি। সাংবাদিক সুভাষ ও সাজ্জাদ চরিত্রদ্বয় গতানুগতিক। উপন্যাসে স্বপন ও মর্জিনা জাবিন দোলার প্রেমপ্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠেনি।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত ঘটনা প্রকাশ করেছেন ঔপন্যাসিক এভাবে:

> গাঙের মোহনায় লড়াই চলছিল। আহত রক্তাক্ত, মুমূর্ষু অবস্থায় মাহবুবরে খাটিয়াৎ কইরা লইয়া আইলো সহযোদ্ধারা, সে তহন কইতাছিল আমারে – আমারে বুবুর বিছানায় শোওয়ায়। আমরা আরিফ সাবের বাড়িৎ আছিলাম। সে কইতাছিল– বুবু কোথায়? বুবু কোথায়? জলদি ডাকো। আমার, আমার সময় নেই। খবর পাইয়া দৌড়াইয়া আইলাম। নিশান তহন ছয়মাসের শিশু। রক্তভিজা কাপড় দেইখ্যা চেঁচাইয়া উঠলাম– মাহবুব! মাহবুব! সোনাভাই আমার! স্থির কণ্ঠস্বরে ডাকলো মাহবুব, বুবু! খুব হাঁপাইতেছিল। কইলো, বুবু! আমার তিনটা কথা। তুমি শুনে রেখো। প্রথম, প্রথম। আমাকে কখনো শহীদ বলো না। কাউকে বলতে দিয়ো না। বলবে মুক্তিযোদ্ধা। শুধু মুক্তিযোদ্ধা। দ্বিতীয়, তোমাদের বাড়ির দক্ষিণ অংশে শিমূলতলায়, হাস্নাহেনার ঝাড়ের কাছে আমাকে। আমাকে, আমাকে। কবর দিয়ো। তৃতীয় তোমার ছেলেকে যেন। ছেলেকে যেন কোনো। অপশক্তি টেনে নিয়ে যেতে না পারে, সেদিকে খেয়াল রেখো। (*ক্যাম্পাস*, পৃ. ২১)

উপন্যাসের ঘটনা, চরিত্রচিত্রণ ও জীবন-পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে ঔপন্যাসিক উপমা-অলংকার নির্মাণ করেছেন। যেমন:

১. দেখিসনা এলপিআরে যাওয়ার পর তোর বাপটা কেমন হয়ে গেছেন! লাইন ছাড়া রেলগাড়ির মতো। (*ক্যাম্পাস*, পৃ. ১২)
২. বেশ মোটাতাজা। ঘুমায় যখন, রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণের মতো। (*ক্যাম্পাস*, পৃ. ২৩)
৩. একটি স্বর্গীয় পুষ্পের মতো রোজা, যেমন সুশ্রী তেমনি কোমল স্বভাব। (*ক্যাম্পাস*, পৃ. ২৬)
৪. একটা অনুভূতির রেখা তড়িৎপ্রবাহের মতো ওর হৃদয়ে খেলে গেল। (*ক্যাম্পাস*, পৃ. ২৯)

Dhaka University Institutional Repository

ক্যাম্‌পাস উপন্যাসে আলাউদ্দিন আল আজাদ সমকালীন রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে একটি পরিবারের করুণ জীবনবাস্তবতা অঙ্কন করেছেন। নগর-কেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের অন্তর্যন্ত্রণা ও বহির্যন্ত্রণার শিল্পরূপ হয়ে উঠেছে এটি। বলা যায়, ক্যাম্‌পাস আলাউদ্দিন আল আজাদের ব্যতিক্রমধর্মী শিল্পকর্ম।

বিশৃঙ্খলা

আলাউদ্দিন আল আজাদের *বিশৃঙ্খলা*[১] উপন্যাসটি গ্রাম ও শহরজীবনের রাজনৈতিক পটভূমিকায় বিম্বিত। উত্তম পুরুষে বর্ণিত এ উপন্যাসটিতে ফুটে উঠেছে আকবর-আফরোজার প্রেমকাহিনি ও জীবন বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। দুইজন নর-নারীর প্রেম প্রসঙ্গ উপস্থাপনের পাশাপাশি মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনা, স্বাধীনতা, শ্রেণিচেতনা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, স্বাধীনতা-উত্তরকালের জীবনবাস্তবতা প্রভৃতি দিকও চিত্রিত হয়েছে।

উপন্যাসের শুরুটা হয়েছে সাংবাদিক ও গল্পকথক জাহাঙ্গীর হোসেন তুষারের আত্মকথনের সূত্র ধরে। কমরেড সৈয়দ মুহাম্মদ আকবরের জীবনচরিত প্রকাশ করবার জন্যেই তরুণ সাংবাদিক জাহাঙ্গীর মুখোমুখি হয় আকবরের স্ত্রী আফরোজার।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ছাত্রনেতা সৈয়দ মুহাম্মদ আকবর ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী। রাজনীতির সূত্র ধরে তার সঙ্গে পরিচয় ঘটে মুসলিম লীগের নেতা ওসমান আলী খন্দকারের সঙ্গে। খন্দকারের বড় কন্যা আফরোজার সঙ্গে প্রণয়সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার। বাবা খন্দকার মেয়েকে অন্যত্র বিয়ে দিতে চাইলেও শেষপর্যন্ত আকবরের সঙ্গেই বিয়ে হয় আফরোজার। রাজনৈতিক আদর্শ ও নীতির দিক থেকে খন্দকার ও আকবরের অবস্থানদুই মেরুতে । খন্দকার সাহেবের এক স্ত্রী, তিন পুত্র ও দুই কন্যা থাকা সত্ত্বেও রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে তিনি বিয়ে করেন জিনাতকে। এদিকে আকবর-আফরোজা পরস্পরকে ভালোবেসে বিয়ে করলেও খন্দকার তাদের বিয়েটাকে মেনে নিতে পারেনি। আকবর একজন বিপ্লবী কর্মী। এক সময় রাজনৈতিক কারণে তার জেল হয়ে যায়। জেল থেকে মুক্ত হবার পর স্ত্রী আফরোজার কাছে না এসে সে আশ্রয় নেয় খন্দকারের দ্বিতীয় স্ত্রী জিনাতের কাছে। একপর্যায়ে তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে প্রণয়সম্পর্ক। অবশেষে আকবর-জিনাত প্রস্থান করে আমেরিকায়।

---

[১] আলাউদ্দিন আল আজাদ, *বিশৃঙ্খল*, *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০০, গতিধারা, ঢাকা। বর্তমান গ্রন্থে *বিশৃঙ্খলা* উপন্যাসের পাঠ এ সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ঈদসংখ্যা রোববার (১৯৯৭)।

মুক্তিযুদ্ধকালে খন্দকার সাহেব আকবর-জিনাতকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। জিনাত ও আকবরের সন্তানকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে তুলে দেয়ার ষড়যন্ত্র করে সে। শেষ পর্যন্ত তার সমস্ত পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের গ্রেনেডের আঘাতে নিহত হয় খন্দকার।

উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে দেখা যায়, আকবর অনুতাপ ও অনুশোচনায় তাড়িত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে আফরোজার কাছে। আকবর ছিল হৃদরোগাক্রান্ত। দুইবার স্ট্রোক করার পর আফরোজার গুলশানের বাড়িতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে আকবর। আফরোজার ডায়েরি থেকে আকবরের অনুশোচনাবোধ সম্পর্কিত একটি উক্তি ছিল এরকম:

> আমি এক জঘন্য পাপী, নরকের নিকৃষ্ট কীট। আমার কেন মৃত্যু হয় না? ... আমার বুকে কি একঝাঁক গুলি এসে লাগতে পারে না? আফরোজা আমাকে সব দিয়েছিল, আমি আজীবন ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলাম। (বিশৃঙ্খলা, পৃ. ৩৪৩)

দশ বছর দাম্পত্য-বিচ্ছিন্ন জীবন কাটিয়েছে আফরোজা। নিজের সামনে সে আকবরের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছে।প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনে যে ভাঙা-গড়ার বিচিত্র লড়াই চলে তা আফরোজা-আকবরের জীবনযাপনের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে 'বিশৃঙ্খলা' উপন্যাসে।

বিশৃঙ্খলা উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণে পরিবেশিত উপন্যাস। উপন্যাসের সূচনা পর্যায়ে জাহাঙ্গীর হোসেন তুষারের দৃষ্টিকোণে বর্ণিত হয়েছে বিভাগোত্তর কাল থেকে স্বাধীনতা-উত্তর কাল পর্যন্ত আকবর-আফরোজার প্রেম, দাম্পত্যজীবন ও বিচ্ছিন্নতার রূপচিত্র। এর পাশাপাশি রাজনৈতিক সংকট, বিপর্যয় ও সংকট-মুক্তির চিত্রও বিশেষভাবে চিত্রিত হয়েছে উপন্যাসে।

বিশৃঙ্খলা উপন্যাসে চরিত্রের সংখ্যা স্বল্প। ঘটনাকে প্রাগ্রসর করার প্রয়োজনেই চরিত্রসমূহ ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক। কোনো চরিত্রই অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়নি। আকবর-আফরোজা চরিত্রদ্বয় বেশ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন ঔপন্যাসিক। ওসমান আলী খন্দকার হীন স্বার্থসম্পন্ন এক নেতা। খন্দকার চরিত্রটির মাধ্যমে আলাউদ্দিন আল আজাদ সমকালীন নেতাদের চরিত্রস্বরূপ দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। আবু সাঈদ শাকুর, আবদুল বারী সুফী, ফজিলত বিবি, আবু দেওয়ান গাজী, জিনাত, মুশতারী, তাজ বানু প্রমুখ চরিত্র গতানুগতিক।

বিশৃঙ্খলা উপন্যাসে বিধৃত উপমা-অলংকার চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। দৃষ্টান্ত:

১. একটু পরে এল সালুয়ার কামিজ ঝলমলে ওড়না পরা আফরোজা, নবীনা ডাহুকীর মত, সঙ্গে সখি মুশতারী। (*বিশৃঙ্খলা*, পৃ. ৩২১)

২. জিনাত ছুটে গেল স্প্রিংয়ের মত। (*বিশৃঙ্খলা*, পৃ.৩৩৮)

৩. ... আকবর তাকিয়ে থাকে ফ্যালফ্যাল করে, বোবার মত। (*বিশৃঙ্খলা*, পৃ. ৩৩৯)

আলাউদ্দিন আল আজাদ *বিশৃঙ্খলা* উপন্যাসে চলিত গদ্যরীতি প্রয়োগ করেছেন। তাঁর ভাষা সহজ, সরল, প্রাঞ্জল। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণাত্মক রীতি অনুসৃত হয়েছে।

বিশৃঙ্খলা উপন্যাসটিতে কাহিনির জটিলতা নেই। শিল্পমানের বিচারে এটি দুর্বল। লেখক শিল্পরূপের চেয়ে বিষয়চেতনার দিকেই অধিক মনোযোগী ছিলেন।

তোমাকে যদি না পাই

আলাউদ্দিন আল আজাদের *তোমাকে যদি না পাই*[১](১৯৯৮) উপন্যাসটি স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রকাশিত একটি রোমান্টিক প্রেমের উপন্যাস। গ্রাম ও শাহরিক জীবনের পটভূমিতে রচিত এ-উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় মুক্তিযুদ্ধ ও প্রেম। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায় থেকে যুদ্ধ-পরবর্তী পরিসরে মুস্তাফিজ-কোহিনুরের জীবনযাপন, মুক্তিযুদ্ধের বিচ্ছিন্ন চিত্র, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার-নির্যাতন, ধর্মীয় কুসংস্কার প্রভৃতি প্রসঙ্গ বিধৃত হয়েছে উপন্যাসে। উপন্যাসের কথক ডাক্তার মুস্তাফিজের বর্ণনাসূত্রে এ উপন্যাসটি রচিত। এর একদিকে রয়েছে ডাক্তার মুস্তাফিজ ও কোহিনুরের অতীত জীবনের স্মৃতিবিজড়িত ঘটনা, অন্যদিকে রয়েছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ-অত্যাচার-ধর্ষণ এবং ধর্মধ্বজীদের ফতোয়া প্রভৃতি ।

[১]আলাউদ্দিন আল আজাদ, *তোমাকে যদি না পাই*, *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, গতিধারা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০০, ঢাকা। বর্তমান গ্রন্থে *তোমাকে যদি না পাই*- এর পাঠ এ-সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ঈদসংখ্যা *রোববার* (১৯৯৮)।

উপন্যাসের ঘটনাংশ উপস্থাপিত হয়েছে ডাক্তার মুস্তাফিজ-সৈকতের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালে তরুণ ডাক্তার মুস্তাফিজকে বাঁচিয়ে ছিল মুক্তিযোদ্ধা হাফিজ আহমদ। বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজের একমাত্র সন্তান সোহেল আহমদ সৈকত। সৈকতের শাশুড়ি কোহিনুর অসুস্থ হওয়ায় মুস্তাফিজকে ঢাকা থেকে নিয়ে আসে সে। কোহিনুরের চিকিৎসাসূত্রে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার অজানা অনেক তথ্য জানতে পারে হাফিজ।

মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে কোহিনুর। অভাবের সংসারে বড় ভাই শাহাব লালন-পালন করেন কোহিনুরকে। একপর্যায়ে হাফিজের সূত্রে কোহিনুরের সঙ্গে পরিচিত হয় মুস্তাফিজ এবং পরস্পরের মধ্যে উপ্ত হয় ভালোবাসার সম্পর্ক। কোহিনুরকে ভালোবেসেছিল মুস্তাফিজ। এতৎপ্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের ভাষ্য লক্ষণীয়:

> অনেকগুলো রাত এল, অনেক গেল। এবং একটি রাত তো ছিল একেবারেই বোঝা, না বোঝারও বাইরে, সৌজন্যের বাঁধাগৎ থেকে নেমে আসে। আপনি ছাড়া অন্য কোনভাবে কখনো সম্বোধন করেনি কোহিনূর, কিন্তু সে রাতে যেন সকল বাঁধন ছিঁড়ে গেল যখন আমার বুকে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে ঠোঁটের কাছে ফিস্‌ফিস্‌ বলল, তোমাকে যদি না পাই– তাহলে, তাহলে আমি আত্মহত্যা করবো না। আমি বেঁচে থাকবো তোমাকে পাওয়ার জন্য, তোমাকে পেলে, মরে যাবো। (*তোমাকে যদি না পাই*, পৃ. ৩৮৪)

কিন্তু ঘটনাক্রমে পাকিস্তানি নরপশু কর্তৃক ধর্ষিত হয় কোহিনুর। অবশ্য সহায়-সম্ভ্রম হারিয়েও বেঁচে যায় সে এবং নিক্ষিপ্ত হয় নিদারুণ জীবনবাস্তবতায়। উপন্যাসের একটি বর্ণনাংশ লক্ষণীয়:

> শোনা যায়, নির্যাতনের অর্ধেকের বেশি মরে গেল। –আহত, রক্তাক্ত–ছিন্নভিন্ন কোহিকে, নানা সে মৃত্যুকে পেলো না। আজরাইল এলেন না তার কাছে, দয়া করলেন না। আসলে ওর মাঝে হয়তো, হয়তো একটা শক্তি ছিল। একটা শক্তি, কেউ জানতো না। সেই শক্তি ওর আয়ুকে ধরে রাখে। –কোহিকে পাওয়া যায় আরও কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে। রেল লাইনের ধারে কারা ফেলে রেখে গেছে। উদ্ধার হল। (*তোমাকে যদি না পাই*, পৃ. ৩৮৬)

নরপশুদের কবল থেকে আত্মরক্ষার পর চিকিৎসার মাধ্যমে সে সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু বড় ভাই শাহাব ফতোয়ার দোহাই দিয়ে কোহিনুরকে গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। শেষ পর্যন্ত কোহিনুরের ইচ্ছানুক্রমে গৃহভৃত্য লখিন্দর কোহিনুরের নানার বাড়ি মরজাইলে তাকে রেখে আসে। কিছুদিন পর বীর মুক্তিযোদ্ধা লস্কর মাহবুব উল্লাহ বিয়ে করে কোহিনুরকে।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে কোহিনুরের চিকিৎসাকালে লখিন্দরের কাছ থেকে এ-সব ঘটনা জানতে পারে মুস্তাফিজ। সৈকতের অনুরোধে যখন সে গ্রামে অবস্থান করে সৈকতের শাশুড়ির চিকিৎসার জন্য, তখন পর্যন্ত মুস্তাফিজ জানতো না সৈকতের শাশুড়ি কোহিনুরই ছিল তার ভালোবাসার মানুষ। কোহিনুরের এ পরিণতি অবিশ্বাস্য এবং এজন্য নিজেকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে মুস্তাফিজ। তার বক্তব্য:

> আমি কাপুরুষ ছিলাম। সেজন্য একটা দুর্ঘটনার অজুহাতে, মনে মনে, আমিও তাকে পরিত্যাগ করেছিলাম। মুক্তিযুদ্ধের আগুনে আমি পুড়েছিলাম, কিন্তু আগুনে সোনার মতো গলতে পারিনি; তার অলঙ্কার হতে পারিনি। (*তোমাকে যদি না পাই*, পৃ. ৩৯৮)

কাহিনির অন্তিম পর্যায়ে দেখা যায়, ঢাকার একটি ক্লিনিকে কোহিনুরকে ভর্তি করা হয়। কিন্তু আত্মীয়-পরিজনের শুভেচ্ছা, চিকিৎসা, শুশ্রূষাকে ব্যর্থ করে কোহিনুর মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুই হয়ে ওঠে তার শেষ পরিণতি।

তোমাকে যদি না পাই উপন্যাসে একজন বীরাঙ্গণা নারীর মর্মন্তুদ কাহিনির চিত্রই শুধু নয়, মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতন-ধর্ষণ প্রভৃতির বর্ণনায়ও ঔপন্যাসিক তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে মুস্তাফিজ-কোহিনুরের ব্যর্থ ও অপূর্ণ প্রেমের কাহিনি।

মুক্তিযুদ্ধ, প্রেমপ্রত্যাশা এবং ব্যর্থতা– এই তিনটি বিষয়কে ধারণ করে বিকশিত হয়েছে *তোমাকে যদি না পাই* উপন্যাস। উপন্যাসের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত কখনো বর্তমান বাস্তব, কখনো অতীতের স্মৃতিবর্ণনসূত্রে কাহিনি অগ্রসর হয়েছে। প্রেক্ষাপট হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে শহর ও গ্রাম। উপন্যাসটি উত্তমপুরুষে বর্ণিত।

উপন্যাসের ঘটনাংশ সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হলেও এর চরিত্রচিত্রণ গতানুগতিক। সোহেল আহমদ সৈকত, জিনাত কোহিনুর খানম, মুস্তাফিজ, হাফিজ, নাসিমা পারভিন কামাল, শিহাব, লখিন্দর প্রমুখ চরিত্র পূর্ণাঙ্গ অবয়বে উদ্ভাসিত নয়। অবশ্য মুস্তাফিজ, কোহিনুর ও লখিন্দর চরিত্র উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ। কাহিনির মূলকেন্দ্র মুস্তাফিজ ও কোহিনুর হলেও তাদের ছাপিয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধকালে এদেশের নারীলক্ষ্মীদের দুর্দশার বয়ান। কোহিনুর চরিত্রটি হয়ে উঠেছে এদেশের স্বাধীনতাপ্রত্যাশী নারীলক্ষ্মীদের যন্ত্রণাময় জীবনের প্রতীক।

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের ভাষা জীবনানুগ। উপন্যাসে ভাষা ব্যবহারে চলিত রীতির পাশাপাশি কখনো কখনো আঞ্চলিক বাগভঙ্গি অনুসৃত হয়েছে। প্রাকরণিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অভিনব বিষয়ের সংযোজনার কারণে এ-উপন্যাসটিকে বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য বলে চিহ্নিত করা যায়।

ঠিকানা ছিল না

আলাউদ্দিন আল আজাদের *ঠিকানা ছিল না*[১] (১৯৯৮) স্বাধীনতা-উত্তর উপন্যাসের ধারায় এক স্বতন্ত্র সংযোজন। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রারম্ভকাল থেকে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা এ উপন্যাসের উপজীব্য। এ উপন্যাসের সমস্ত ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে মযহার আলী কাজীকে উপলক্ষ করে। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, স্বদেশপ্রেম, আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মুক্তিযুদ্ধকালীন ব্যাংক লুট, হত্যা, সন্দেহ, ভয়, অবৈধ ব্যবসা, আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা প্রভৃতি এ-উপন্যাসের বিষয়। স্বল্প পরিসরের এই উপন্যাসটিতে মুক্তিযুদ্ধের অতীত ঘটনা চিত্রাঙ্কনের পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মের চিন্তা-চেতনা ও প্রতিবাদী কণ্ঠও উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক।

ঠিকানা ছিল না উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মযহার আলী কাজী । ব্যবসায়ী মযহারের কর্মব্যস্ত জীবন নিয়ে উপন্যাসকাহিনির সূত্রপাত হলেও লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণে তার মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকা, আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনা প্রভৃতি এ-উপন্যাসে শিল্পরূপ পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ব্যাংকের টাকা লুট করে অনেক অর্থবিত্তের মালিক হয় মযহার। অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থের ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে সে খুন করে সহকর্মী, দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা জয়নাল আবেদীনকে। অতঃপর অপকৌশলের মাধ্যমে ব্যাংকের লুট করা অর্থ বৈধ করার কাজে সে সম্পৃক্ত করে ব্যাংকার মোহাম্মদ হামিদউল্লাহ কাজীকে। হাবীব ব্যাংকের কর্মকর্তা হামিদউল্লাহর এই অবৈধ কাজের প্রতিদানস্বরূপ তাঁর বড় মেয়ে সাবরিনা মমতাজ রিনাকে বিয়ে করে মযহার। ব্যাংক লুটের অর্থ দিয়ে সে প্রতিষ্ঠা করে অবৈধ

[১]আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'ঠিকানা ছিল না', *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, গতিধারা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০০, ঢাকা। বর্তমান গ্রন্থে *ঠিকানা ছিল না*-র পাঠ এ-সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ঈদসংখ্যা পালাবদলে (১৯৯৮)।

কারখানা। অবৈধ উপায়ে লুণ্ঠিত এই অর্থই স্বাধীনতা-উত্তরকালে তাকে করেছে সমৃদ্ধিশালী; আতঙ্কিত, সন্দেহবাতিকগ্রস্ত ও দ্বন্দ্বজটিল।

উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র জয়নাল আবেদীন। সে স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত এক বীর মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিযোদ্ধা মযহার ও মারফতও ছিল তার দলে। জয়নাল নিবেদিতপ্রাণ মুক্তিযোদ্ধা। নির্দিষ্ট কোনো গণ্ডি নয়, সারা বাংলাদেশই যেন তার ঠিকানা। সংসারের বন্ধন ছিন্ন করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সে। স্ত্রী হাস্না এবং একমাত্র সন্তান জয়কে ফেলে রেখে যুদ্ধে গিয়েছিল সে। স্ত্রী হাস্না মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুললে সে প্রত্যুত্তর করে এভাবে:

> জয়ের জন্যই তো আমি যুদ্ধে যাচ্ছি! (*ঠিকানা ছিল না*, পৃ. ৩৬৬)

শেষ পর্যন্ত জয়নাল খুন হয় মযহারের হাতে। মুক্তিযোদ্ধা মারফতও জড়িয়ে পড়ে ভিক্ষাবৃত্তিতে। মযহারও আক্রান্ত হয় মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায়। স্বাধীন বাংলাদেশে কখনও নিশ্চিন্ত চিত্তে জীবিকা অর্জন করতে পারেনি সে। একসময় ড্রাইভার লোকমান কর্তৃক সর্তক বার্তা আসে মযহারের কাছে। সে বুঝতে পারে পাপের অভিশাপ তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। ঘটনাক্রমে মযহার আলীর অতীত ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড জানতে পারে তার একমাত্র মেয়ে মিমি। বীর মুক্তিযোদ্ধা জয়নাল আবেদীনের পুত্র জয়ই মিমিকে জানিয়ে দেয় তার পিতার সমূহ অপকীর্তির কথা। অতঃপর –

> ... সহসা মিমি ব্যাকুলভাবে দৌঁড়ে তাঁর কাছে চলে এল এবং বিকারগ্রস্তের মত বলতে লাগল, বলুন বাবা সত্য কথা বলুন। আমি সত্য জানতে চাই। বলুন মুক্তিযুদ্ধের সময়। হ্যাঁ মুক্তিযুদ্ধের সময় জয়ের বাবাকে আপনি হত্যা করেছেন? (*ঠিকানা ছিল না*, পৃ. ৩৭১)

মেয়ের অভিযোগ প্রথম পর্যায়ে অস্বীকার করে মযহার। অনেকটা অসহায় ও আতঙ্কিত হয়ে পালাবার পথ খুঁজে সে। এমতাবস্থায় মিমি আরও দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করে:

> ... পালাবার আর পথ নেই, বাবা। যে নিজের চোখে দ্যাখে, তাকেই তো সাক্ষী বলা হয়। আপনার কাণ্ড যে নিজের চোখে দেখেছে, সেই সাক্ষীই বলেছে। (*ঠিকানা ছিল না*, পৃ. ৩৭১-৩৭২)

উপন্যাসের অন্তিম পর্যায়ে দেখা যায়, মেয়ে মিমির কাছে জয়নালকে খুন করার কথা স্বীকার করে মযহার। জয়নালের মৃত্যুদৃশ্য কল্পনা করতে করতে সে বলে–

> ... সে কঁকাতে থাকে, কুঁকড়ে কুঁকড়ে, গড়াতে গড়াতে পানির মধ্যে গিয়ে পড়ল। তার আগে শুনেছিলাম বলছিল বিশ্বাসঘাতক! তুই জাহান্নামে যাবি। জ্বলবি, শুধু জ্বলবি। (*ঠিকানা ছিল না*, পৃ. ৩৭২)

শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে মুক্তি পেয়েছে মযহার। একদিন ভোরবেলায় নিজ বাড়িতেই তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। মযহারের মৃত্যু সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের ভাষ্য:

> সেই রাতে বৃক্ষলতা ছাওয়া বিশাল বাড়িটা কি এক মায়ার ঘোরে যেন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, ... ভোর হয়ে গেলে দেখা যায়, সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে সে পাকার মধ্যে মযহারের মৃতদেহ, ডান কানের উপরাংশে মাথাটা পিস্তলের গুলীতে রক্তাক্ত। (*ঠিকানা ছিল না*, পৃ. ৩৭২)

ঠিকানা ছিল না উপন্যাসে আলাউদ্দিন আল আজাদ শহর-জীবনের পটভূমিতে মযহার কাজীর জীবনকথার চিত্রই উপস্থাপন করেছেন। পাপাচার ব্যক্তিমানুষের অন্তর্জগৎকে কীভাবে নিঃশেষ করে দেয়, তা প্রদর্শিত হয়েছে এ-উপন্যাসে। পাপাচারে গড়ে ওঠা জীবনসৌধ যে কতবেশি ভঙ্গুর তা উপলব্ধি করা যায় মযহার কাজীর করুণ পরিণতিসূত্রে। উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত সত্যের জয়ই বিঘোষিত হয়েছে।

এ উপন্যাসের কলেবর ক্ষুদ্র হলেও প্রকরণশৈলী বিচারে উপন্যাসটি শিল্পসফল। মুক্তিযুদ্ধকালে ও স্বাধীনতা-উত্তর সময়পটে মযহারের আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাধারা, ব্যাংক লুট, সহকর্মী বন্ধু জয়নালকে হত্যা, মেয়ের কাছে অপরাধ স্বীকার প্রভৃতি ঘটনা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করতে পেরেছেন ঔপন্যাসিক।

বিষয়াংশ উপস্থাপনের পাশাপাশি চরিত্র নির্মাণেও প্রাজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন লেখক। বীর মুক্তিযোদ্ধা মযহার আলী এ উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের কেন্দ্রবিন্দু। সে কারখানার মালিক, কিন্তু কারখানাটি গড়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তীকালে ব্যাংক লুটের অবৈধ অর্থ দিয়ে। মযহার আলী চরিত্রটি পূর্বাপর উজ্জ্বল। লোকমান, বিনা আলী, মোহাম্মদ হামিদউল্লাহ কাজী, রওনক জাহান পারুল, কুর্সিবিবি, হাসনাত আবেদিন জয়, জয়নাল আবেদীন, মিমি, মারফত আলী প্রমুখ চরিত্র উপন্যাসের কাহিনিকে গতিশীল করে তুলেছে।

ঠিকানা ছিল না সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ অবলম্বনে রচিত। কখনো কখনো ঘটনাংশকে প্রাগ্রসর করবার প্রয়োজনে ঔপন্যাসিক চরিত্রচিত্তের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন সচেতনভাবে। জীবনের রূপ-রূপান্তর, চরিত্রের অন্তর্জগৎ ও বহির্জাগতিক ঘটনা, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও স্মৃতিময় অনুষঙ্গ নির্মাণে লেখক বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন।

ঠিকানা ছিল না-র ভাষারীতি সহজ, প্রাঞ্জল, স্বচ্ছন্দ ও নির্ভার। চলিত ভাষারীতি অনুসরণ করেছেন লেখক। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের ব্যবহৃত ভাষাও চলিত। মূলত ভাষা ব্যবহারের অভিনবত্বেই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রসমূহ পাঠকের কাছে হয়ে উঠেছে সহজ ও বোধগম্য।

স্বল্পায়তনিক এ উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্রের ক্রমবিকাশ স্পষ্ট নয়। মূল কাহিনি মযহার আলী কাজীকে কেন্দ্র করে বিন্যস্ত হওয়ায় পার্শ্বিক চরিত্রসমূহ তেমন বিকশিত নয়। প্রসঙ্গত বলা যায়, কাহিনি নির্মাণে প্রাজ্ঞতার পরিচয় থাকলেও প্রকরণশৈলী নির্মাণে খুব একটা সার্থকতার পরিচয় দিতে পারেননি লেখক। অবশ্য সামান্য ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেও *ঠিকানা ছিল না* উপন্যাসে আলাউদ্দিন আল আজাদ কাহিনিবর্ণনে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা প্রশংসাব্যঞ্জক।

হলুদ পাতার ঘ্রাণ

আলাউদ্দিন আল আজাদ *হলুদ পাতার ঘ্রাণ*[১] (১৯৯৯) উপন্যাসে নগরজীবনের পটভূমিতে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের জীবনকাহিনি উপস্থাপন করেছেন। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত দুই পরিবারের বহুমুখী সংকট, নানা দ্বান্দ্বিকতা ও প্রেমসম্পর্কিত জটিলতা তাঁর এই উপন্যাসের উপজীব্য। মধ্যবিত্ত পরিবারের দারিদ্র্য, সংকট, হতাশা, প্রেম, স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নভঙ্গের চিত্রাঙ্কনের পাশাপাশি উচ্চবিত্ত পরিবারের নৈতিক অবক্ষয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন, অবৈধ ব্যবসা ও অর্থোপার্জন প্রভৃতি প্রসঙ্গও উপস্থাপিত হয়েছে উপন্যাসে।

[১]আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'হলুদ পাতার ঘ্রাণ', *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ২০০১, গতিধারা, ঢাকা। বর্তমান গ্রন্থে *হলুদ পাতার ঘ্রাণ*-এর পাঠ এ সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ঈদসংখ্যা *অন্যদিনে* (১৯৯৯)।

উপন্যাসের ঘটনাংশ উন্মোচিত হয়েছে খোরশেদ আলম খান ও মফিজ মাস্টারের জীবনবাস্তবতাকে কেন্দ্র করে। একই শহরে পাশাপাশি বাড়িতে বসবাস করেন মধ্যবিত্ত পরিবারের মফিজ মাস্টার ও উচ্চবিত্ত পরিবারের খোরশেদ আলম খান। কিন্তু দুই পরিবারের মধ্যে কোনো সম্পর্ক ছিল না। উপন্যাসের সূচনা পর্যায়ে দেখা যায়, মফিজ মাস্টারের ছোট ছেলে শেখ আবদুস সালাম তুষার অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ডাক্তারি পাশ করে শ্রীপুর রুরাল হেল্‌থ সেন্টারে সরকারি মেডিকেল অফিসার হিসেবে নিযুক্তিলাভ করে। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান তুষার। টানাপড়েনের সংসারে থাকেন বাবা মফিজ মাস্টার, বড় ভাই মাজেদ ও ভাবী রোকেয়া, ছোটবোন রোকেয়া বানু চামেলি। তুষারের স্বপ্ন ছিল একটি ক্যান্সার হাসপাতাল নির্মাণ করার। কারণ তাঁর মেজো ভাই আষাঢ় ক্যান্সার-আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। এক বছরের মাথায় মা ফাতেমা খাতুন মারা যান পুত্রশোকে। দারিদ্র্যক্লিষ্ট এই পরিবারের বড় ছেলে মাজেদ কেরানির চাকরি করে কোনো রকমে সংসার চালায়। এমতাবস্থায় তুষার সরকারি চাকরি পাওয়ার সুবাদে সবাই আনন্দিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুষার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি চাকরি ছেড়ে পিজি হাসপাতালে, গবেষক হিসেবে যোগ দেয় । এই তুষারের সঙ্গেই প্রেমসম্পর্ক গড়ে ওঠে খোরশেদ আলম খানের কন্যা মুস্তারিখানম রাত্রির। কিন্তু তাদের সম্পর্ক মেনে নিতে পারেননি রাত্রির ভাই শিল্পপতি ও প্রভাবশালী মোরশেদ খান। মোরশেদের অবৈধ সম্পদ, বিলাসিতা ও আভিজাত্যের কারণে বাবা খোরশেদ আলম খান ও মা আক্তারী খানম শহর থেকে প্রস্থান করেন গ্রামে। স্ত্রী আয়েশা ও বোন রাত্রি মোরশেদের অবৈধ অর্থোপার্জন ও অসঙ্গত আচরণ পছন্দ করতো না। তাছাড়া অফিস থেকে মদ্যপান করে বাড়ি ফিরত মোরশেদ। এমনকি স্ত্রী আয়েশা ও একমাত্র সন্তান হিলমিকের সঙ্গেও অসঙ্গত আচরণ করতো সে। ব্যবসার এক পর্যায়ে মোরশেদ খানের সঙ্গে তসলিম গ্রুপের দ্বন্দ্ব হলে শেষ পর্যন্ত মীমাংসার লক্ষ্যে নিজের বোন রাত্রিকে তসলিমের কাছে সমর্পণের চেষ্টা করে মোরশেদ। রাত্রি হয়ে ওঠে মোরশেদের আত্মরক্ষার হাতিয়ার। এ-প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক মোরশেদের দৃষ্টিকোণে যে বর্ণনাংশ উপস্থাপন করেছেন তা লক্ষণীয়:

> ওদেরকে আমি হাত করে ফেলেছি। হ্যাঁ, তসলিম গ্রুপ। তসলিম বলিষ্ঠ, শিক্ষিত যুবক। এখন কোটিপতি। বাড়ি গাড়ি তো আছেই। ... সে অবিবাহিত, প্রস্তাব দিয়েছে। মুস্তারীকে ওর খুব পছন্দ, রাণীর হালে রাখবে। আর মৃদু হেসে বললেন, আর, এ সম্পর্ক হবে আমার রক্ষাকবচ! আমাকে কেউ আর ঘাটাতে সাহস করবে না। (*হলুদ পাতার ঘ্রাণ*, পৃ. ৬৬৯)

শুধু নিজের বোন রাত্রিকেই বিক্রি করার পরিকল্পনা করেনি, স্ত্রী আয়েশা খানম ও সন্তান হিলমিককেও ঘর থেকে বের করে দিয়েছে মোরশেদ। পুত্রসন্তান পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে গেইটি আলিকে বিয়ে করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে স্ত্রী আয়েশার কাছে। পিতা মোরশেদের এই আচরণ মানতে পারেনি মেয়ে হিলমিক। রাত্রি বাসা থেকে পালিয়ে আশ্রয়গ্রহণ করে পাশের বাড়িতে, মফিজ মাস্টারের কাছে। মাস্টারের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে আয়েশা ও হিলমিকও। অবশেষে আয়েশা ও হিলমিককে নিয়ে রাত্রি আশ্রয়প্রাপ্ত হয় গ্রামের বাড়িতে। অতঃপর সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে গ্রামীণ পরিবেশে তুষার ও রাত্রির মধ্যে পরিণয় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। গ্রামীণ পরিবেশে তুষার-রাত্রির প্রেমপ্রসঙ্গ উপন্যাসের সমাপ্তিতে লেখক উপস্থাপন করেছেন এভাবে:

> রাতের বেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর হাঁটতে হাঁটতে মেঘনার পারে চলে যায় দুইজন। অথৈঅথৈ পানি। বাতাস, ঢেউয়ের কুল্‌কুল্‌ ধ্বনি। গভীরভাবে বুকে জড়ায় রাত্রিকে তুষার, উপরে আকাশের সামিয়ানা। অদূরের গাছপালা অরণ্য থেকে প্রগাঢ় প্রবাহে বয়ে এসে কী এক মদিরায় ওদেরকে বিভোর করে দিচ্ছে হলুদ পাতার ঘ্রাণ। (*হলুদ পাতার ঘ্রাণ*, পৃ. ৬৭২)

উপন্যাসটি লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণে রচিত। উপন্যাসে প্রযুক্ত হয়েছে গতিময় অনুষঙ্গ। কখনো কখনো লেখক স্মৃতিময় অনুষঙ্গে উপন্যাসের ঘটনাংশ বর্ণনা করেছেন। উপন্যাসে আয়েশার স্মৃতিসত্তাজাত চেতনা লেখক চিত্রাত্মক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন:

> ভাসছিল ডুবছিল দেশের নানা ছবি, গ্রামের ছবি। গ্রামের প্রান্তে হাঁসুলি-বাঁক নেওয়া টলটলে পানির পুরাতন ব্রহ্মপুত্র। হেমন্তের খামার তোলা হয়নি, বরং আরও ভরা-ভরা। কলাই খেত। সরস হলুদ শর্ষে ফুলের সোঁদালো গন্ধ, ফসলের সেই মাঠে ডুমা কাপড় পরে চুল উড়িয়ে যে কিশোরী ছুটে বেড়িয়েছে সইদের সঙ্গে, তাকেও স্পষ্ট দেখতে পান। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগের ঘটনা, অথচ যেন সেইদিন। তখন বয়স তো সাত-আট বছরের মতো ছিল। কেমন ছুঁৎ করে সময়টা কেটে গেল। শাদামাটা, সহজ সরল। অগোচরে নয়, বড়রা প্রকাশ্যেই বলতেন বগি। অনেক কিছুই বুঝতো না, অনেক কিছুই ভাবতে পারতো না। ডাহা বোকা আর কী! বুবুদের, ছোট ফুপুদের বিয়েশাদির হৈচৈ, উৎসব কত দেখেছে, অথচ কখনো মনে হতো না, তারও হবে একদিন! (*হলুদ পাতার ঘ্রাণ*,পৃ. ৬২৭)

হলুদ পাতার ঘ্রাণ উপন্যাসে চরিত্রসংখ্যা স্বল্প। তুষার ও রাত্রিই এ উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। স্বপ্নবিলাসী, আত্মপ্রত্যয়ী, পরিশ্রমী তুষার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও লক্ষ্যচ্যুত হয়নি; বরং সাহস ও ধৈর্য দিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। তাঁর মতো আত্মপ্রত্যয়ী চরিত্র দুর্লভ। রাত্রি অসাধারণ একটি চরিত্র। উচ্চাভিলাসী ভাই মোরশেদের পরিবারে বসবাস করেও রাত্রি

জীবনযাপন করেছে সাদাসিধেভাবে। ভাইয়ের অন্যায়কে কখনও প্রশ্রয় দেয়নি সে। বরং ভাইয়ের অন্যায়কে মেনে নিতে না পেরে আশ্রয় নিয়েছে গ্রামের বাড়িতে। মনজুর মোরশেদ খান উচ্চবিত্ত ও বিকৃত রুচির চরিত্র। আয়েশা চরিত্রটি যেন এক ধৈর্যশীল নারীর প্রতিনিধি। অভিজাত পরিবারের মেয়ে হয়েও কখনও বিলাসী জীবনের স্বপ্ন দেখেনি সে। হিলমিক, মফিজ মাস্টার, আজমেরি, রাবেয়া, শাওন, মাজেদ, চিত্রা ঘোষ, ডা. সৈয়দ মাহবুব উল্লাহ, গেইটি আলি প্রমুখ চরিত্র গতানুগতিক। তবে এসব চরিত্র ঘটনাধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

হলুদ পাতার ঘ্রাণ উপন্যাসটিতে সরল ভঙ্গিতে কাহিনি অগ্রসর হয়েছে। উপন্যাসটির কাহিনি চিত্রণে কোনো জটিলতা নেই।

ঔপন্যাসিক চরিত্র-চিত্রণ ও জীবন-পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে উপমা-অলংকার নির্মাণ করেছেন। যেমন:

১. ... চম্পা চেহারায় চলনে বলনে প্রকৃতই ছিল চাঁপাফুলের মতো। (*হলুদ পাতার ঘ্রাণ*, পৃ. ৬৪০)

২. তার একান্ত কথাবার্তা অনেকটা মনোরোগীর মতো। (*হলুদ পাতার ঘ্রাণ*, পৃ. ৬৬৪)

৩. তার রাগতো বজ্রের মতো, আশেপাশে কিছু রাখে না। (*হলুদ পাতার ঘ্রাণ*, পৃ.৬৬০)

হলুদ পাতার ঘ্রাণ উপন্যাসে বেশ কয়েকটি প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। যেমন: 'বামন হয়ে চাঁদের পানে হাত', 'সাপও মরে লাঠিও ভাঙে না', 'খোদার খাসি' প্রভৃতি।

উপন্যাসটিতে বৈষ্ণব পদাবলীর দুটি চরণ উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক । যেমন:

> জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল। লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল। (*হলুদ পাতার ঘ্রাণ*, পৃ. ৬৭১)

হলুদ পাতার ঘ্রাণ উপন্যাসে আলাউদ্দিন আল আজাদ চলিত ভাষারীতিই অনুসরণ করেছেন। একটি দৃষ্টান্ত এতৎপ্রসঙ্গে লক্ষণীয়:

> সংকল্পে শ্রমে সাধনায় তোমার স্বপ্নকে সফল কর, আমাকে পাবে তুমি। চেষ্টা কর, বৃত্তি পাবে। ইউরোপ চলে যাবে তুমি। আমি প্রস্তর মূর্তি হয়ে থাকবো অনন্তকাল ধরে তোমার প্রতীক্ষায়। (*হলুদ পাতার ঘ্রাণ*, পৃ. ৬৭২)

হলুদ পাতার ঘ্রাণ উপন্যাসে অভাব-অনটনময় জীবন চিত্রাঙ্কনের পাশাপাশি উচ্চবিত্ত শ্রেণির জীবন-যাপন চিত্র শিল্পরূপময় করে উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। এ-উপন্যাসে

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা-উত্তর আধুনিক সমাজব্যবস্থার রূপচিত্রাঙ্কনে আলাউদ্দিন আল আজাদ নিঃসন্দেহে আন্তরিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

কায়াহীন ছায়াহীন

আলাউদ্দিন আল আজাদের *কায়াহীন ছায়াহীন*[১] (১৯৯৯) উপন্যাসে শিল্পিত হয়েছে একজন নারীর অন্তর্বেদনা, নৈঃসঙ্গ্যদশা ও প্রেমবিচ্ছিন্ন জীবনকাহিনি। গ্রাম ও শহরের পটভূমিতে বর্ণিত এ-উপন্যাসের সমগ্র ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করা হয়েছে সাকী রেজওয়ান ও আঁখি নাজনীনকে। মা ও মেয়ের অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ উপস্থাপনায় উপন্যাসবিধৃত মানবজীবন হয়ে উঠেছে হার্দ্য-যন্ত্রণার শিল্পরূপ।

কায়াহীন ছায়াহীন উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সাকী ও রেজওয়ানের জীবন উন্মোচনের সূত্রে প্রেম-বিয়ে-স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নভঙ্গের এক বাস্তব আখ্যান উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। গ্রামীণ পরিবেশ থেকে উঠে আসা একজন নারীর শাহরিক জীবনসংগ্রামের ইতিবৃত্ত বয়ান করেছেন ঔপন্যাসিক অসাধারণভাবে। সংসার, স্বামী, সন্তান, অভিনয়, কোনোটাই শেষ পর্যন্ত সাকীর জীবনে স্থায়িত্ব পায়নি। গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে-ওঠা মেয়ে সাকী। সে নাচে ও অভিনয়ে বেশ পারদর্শী। কিন্তু বাবা আবদুর রহমান মেয়ের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডকে মোটেই পছন্দ করতেন না। তাই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করলেন এক গ্রাম্য মোল্লার সঙ্গে। কিন্তু এই বিয়েতে সম্মতি ছিল না সাকীর। শেষ পর্যন্ত মামাতো ভাই রেজোয়ানুল হকের সহযোগিতায় সাকী গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে। একপর্যায়ে তাকে বিয়েও করে সাকী। রেজওয়ান ও সাকী ঢাকা শহরে এসে আশ্রয়প্রাপ্ত হয় জিন্নাত আলীর বাসায়। এই বাসায় অবস্থানসূত্রেই সাকী চিত্রজগতে প্রবেশ করে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে সাকী ও রেজওয়ানের দাম্পত্যজীবনে বিচ্ছিন্নতা ঘটে। স্বল্পস্থায়ী দাম্পত্যজীবনের নিদর্শন হয়ে থাকে তাদের সন্তান আঁখি নাজনীন।

শহরে আগমনের পর মুক্তচিন্তায় ও পরিবেশে জীবন অতিবাহিত করতে চেয়েছিল সাকী। কিন্তু নারী হিসেবে সে তার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পারেনি। অনেকটা মৌলিক চিন্তা-ভাবনা ও কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়েই নিজেকে গড়ে তুলতে চেয়েছিল সে। কিন্তু শেষ

[১] আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'কায়াহীন ছায়াহীন', *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ২০০১, গতিধারা, ঢাকা। বর্তমান গ্রন্থে *কায়াহীন ছায়াহীন*-এর পাঠ এ সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ঈদসংখ্যা *বিনোদন বিচিত্রায়* (১৯৯৯)।

পর্যন্ত তার আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নে ফাটল ধরে। স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একজন মনের মানুষ খুঁজছিল সাকী। মোরশেদ মাহমুদ নামে এক ছেলেকে ভালোও বেসেছিল সে। একপর্যায়ে রহস্যজনকভাবে খুন হয় মোরশেদ। অতঃপর সাকীর জীবনেও নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। এসিডে ক্ষত-বিক্ষত হয় তার চেহারা :

> ... গাছের আড়াল থেকে কে একজন বড় এক ঝলক এসিড নিক্ষেপ করল। আর্তচিৎকার ক'রে ওঠে সাকী। চেহারা বিকৃত, একটা চোখও নষ্ট হয়ে গেল। (*কায়াহীন ছায়াহীন*, পৃ. ৭১৩)

প্রাণে রক্ষা পেলেও বিনষ্ট হয় সাকীর সৌন্দর্য, অভিনয় ও সংসারজীবন। নিমগ্নতা, ব্যর্থতা, হতাশা, বিষাদ, বিস্মৃতি আর অন্ধকারের মধ্যে সে আশ্রয় সন্ধান করে।

সাকীর জীবনে নেমে আসা এ-বিপর্যয়ের কথা জানতে পারে তার মেয়ে আঁখি। সমুদ্রে ভ্রমণসূত্রে সাকীর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী নাসরীন গাজীর সঙ্গে পরিচয়সূত্রে সবকিছুই জেনে যায় সে।

এই উপন্যাসের মূল ঘটনাংশের পাশাপাশি আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। তা হলো আঁখি নাজনীন ও খালেদ মাসুদ শান্তর প্রেম ও বিবাহ। উচ্চবিত্ত পরিবারের অবসরপ্রাপ্ত আমলার ছেলে খালেদ মাসুদ শান্তকে ভালবেসে বিয়ে করে আঁখি নাজনীন। নবীন কণ্ঠশিল্পী আঁখি। কিন্তু শান্তর পরিবার আত্মপরিচয়হীন ও নিম্নবিত্ত ঘরের সন্তান আঁখিকে প্রথমে মেনে না নিলেও শান্তর কথা ভেবে মেনে নেয়। কিন্তু তার স্বামী শান্ত একজন অসৎ ব্যবসায়ী ও প্রতারক। স্বামীর সঙ্গে ভ্রমণকালে কক্সবাজার অবস্থানসূত্রে আঁখি জানতে পারে স্বামীর কৃতকর্ম সম্পর্কে। ঢাকা থেকে আগত তিন বন্ধুর মাধ্যমে শান্তর জীবনের অন্ধকার দিক উন্মোচিত হয় আঁখির কাছে। শান্তর সহকর্মী বাপ্পা তার কর্মকাণ্ডের কথা বলে নানাভাবে উৎকণ্ঠিত করে তোলে আঁখিকে। এতৎপ্রসঙ্গে উপন্যাসে একটি এলাকা লক্ষণীয়:

> আপনাকে জানিয়ে যাই—শান্ত খুন হয়ে যেতে পারে। এক কোটি টাকা নাকি মেরেছে। ওর গডফাদার লোক লাগিয়েছে। ... আপনাকে অনুরোধ করছি, নিজের প্রতি উদাসীন থাকবেন না। (*কায়াহীন ছায়াহীন*, পৃ. ৭১৬)

উপন্যাসের অন্তিম পর্যায়ে দিশেহারা আঁখি শরণাপন্ন হয় নাসরীন গাজীর। এবং বলে :

> আমাকে বাঁচান, আন্টি। জড়িয়ে ধরে কাতরে ওঠে আঁখি, আতঙ্কিতভাবে বলল, শান্ত আমাকে খুন করবে। ... আগে বুঝতে পারিনি অপরাধজগতের সঙ্গে জড়িত। স্টেডিয়ামের ওর ইলেকট্রনিকসের

> দোকানটা একটা শোমাত্র। আপনারা সকালে রওয়ানা দিচ্ছেন তো। আমি আপনার সঙ্গে চলে যাবো, আন্টি। আমার মা আপনার সই ছিলেন, আমাকে ফেলে দেবেন না –
> (*কায়াহীন ছায়াহীন*, পৃ. ৭১৭)

এ-উপন্যাসে স্বাধীনতা-উত্তর সময়, সমাজ ও জীবনের বাস্তব সত্যকে উন্মোচন করতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক। নারীর অসহায়তা ও সংগ্রামশীল চেতনারই প্রতিফলন ঘটেছে এ-উপন্যাসে।

ছায়াহীন কায়াহীন উপন্যাসে আলাউদ্দিন আল আজাদ ঘটনা-বিস্তারের দিকেই অধিক মনোযোগী ছিলেন। আঁখি নাজনীন, খালেদ মাসুদ শান্ত এবং সাকী ব্যতীত প্রতিটি চরিত্র বৈচিত্র্যহীন। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে উপন্যাসের গায়িকা আঁখি, নায়িকা সাকী, প্রযোজক মুস্তাফা, বিউটিশিয়ান নাসরিন গাজী এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগের জুনিয়র সহকারী রেজওয়ান প্রসঙ্গ থাকলেও শেষ পর্যন্ত তাদেরকে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করতে সক্ষম হননি ঔপন্যাসিক।

এ উপন্যাসের সাকী রেজওয়ান চরিত্রটি গ্রাম ও শহরের পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে নির্মাণ করেছেন লেখক। সাকী রেজওয়ানের অতীত ও বর্তমানের রূপচিত্রাঙ্কনে তিনি ছিলেন আন্তরিক। সময়ের ব্যবধানে একজন প্রতিভাময়ী নারীর জীবন কতটা মর্মান্তিক ও সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে তা সাকী চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীরা কর্মক্ষেত্রে, পরিবারে ও বাস্তবজীবনে কতটা সমস্যার সম্মুখীন, তা সাকী ও আঁখি চরিত্রদ্বয়ের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। স্বাধীনভাবে জীবননির্বাহ ও সৃজনী প্রতিভা বিকশিত করার উদ্দেশ্যে সাকী গ্রাম ছেড়ে শহরে অবস্থান করলেও শেষ পর্যন্ত গোপনশত্রু কর্তৃক নিক্ষেপিত এসিডে ঝলসে যায় তার জীবন। নিজের সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করার চেষ্টা করলেও তার বাবা ও স্বামীর সম্মতি অর্জনে ব্যর্থ হয় সে। অন্যদিকে আঁখি উচ্চবিত্ত পরিবারে বিয়ে করলেও সুখী হতে পারেনি। তার স্বামী গানকে সম্মান জানালেও শান্তর মা-বাবা তা মোটেও পছন্দ করতো না। তাছাড়া শেষ পর্যন্ত আঁখি জানতে পারে তার স্বামী ও একজন প্রতারক ব্যবসায়ী।

এ উপন্যাসে প্রধানত চলিত গদ্যরীতি অনুসৃত হয়েছে। *ছায়াহীন কায়াহীন* উপন্যাসের বিষয়াংশের সঙ্গে ভাষার সাযুজ্য রক্ষিত। আধুনিক মানুষের নিয়ত-উচ্চারিত শব্দানুষঙ্গ উপন্যাসটিকে দিয়েছে ভিন্নস্বাদী ব্যঞ্জনা।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রাতিস্বিকতামণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। যেমন ছোটগল্প তেমনি উপন্যাস রচনায় তিনি প্রদর্শন করেছেন লক্ষণীয় কৃতিত্ব। বিভাগোত্তর বাংলাদেশের উপন্যাস-সাহিত্যে তাঁর অবদান অসামান্য। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তানি শাসকচক্রের অব্যাহত নিপীড়ন, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-ভাষিক-সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বাঙালির আন্দোলন-সংগ্রাম, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সাহিত্যসত্তার উন্মেষ। পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্য-দর্শনের পঠন-পাঠনের সঙ্গে আবহমান বাঙালি সংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়ায় তাঁর সাহিত্যভাবনায় যুক্ত হয়েছে প্রগতিশীল জীবনচেতনা।

আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাসসমূহকে কালিক বিবেচনায় দুইভাগে বিন্যস্ত করা যায়: ১. বিভাগোত্তরকালের উপন্যাস; ২. স্বাধীনতা-উত্তরকালের উপন্যাস। বিভাগোত্তরকালে রচিত তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা চারটি, এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা বিশটি। সর্বমোট চব্বিশটি উপন্যাসে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্যবোধ, সমাজমুখী চেতনা, মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং শহরবিচ্ছিন্ন প্রান্তিক জীবন ও পরিবেশের প্রতি তাঁর মুগ্ধতা। সর্বোপরি মানুষ, মানবতা, জীবনই হয়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্যচিন্তার মুখ্য উপাদান।

বিভাগোত্তরকালে রচিত আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাসসমূহ হচ্ছে –*তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন*, *কর্ণফুলী* এবং *ক্ষুধা ও আশা*। এসব উপন্যাসে মানবমনস্তত্ত্ব, ফ্রয়েডীয় লিবিডো, মধ্যবিত্ত নর-নারীর প্রেম-প্রত্যাশা, সার্থকতা কিংবা ব্যর্থতা, দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতা, তাদের আর্থিক সংকট, প্রান্তিক মানুষের জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি, গ্রামীণ ও শহুরে জীবনধারার চিত্রপট, দুর্ভিক্ষ, উদ্বাস্তু সমস্যা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, অস্তিত্ব-সংগ্রাম প্রভৃতি শিল্পরূপময় হয়ে উঠেছে। এসব প্রসঙ্গ উপন্যাসের কাহিনিকাঠামো ও বিষয়ভাবনাকে করেছে সমৃদ্ধ।

বিভাগোত্তরকালে রচিত *তেইশ নম্বর তৈলচিত্রে* প্রেম ও মনস্তত্ত্ব, *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন* উপন্যাসে লিবিডোচেতনা, *কর্ণফুলী* উপন্যাসে নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনাভিজ্ঞতা বহির্ভূত চট্টগ্রাম ও পাবর্ত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকার Local color and habitations এবং *ক্ষুধা ও আশা* উপন্যাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়কালের দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, স্বাধীনতা-সংগ্রাম, দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি এবং সাধারণ মানুষের আশাবাদী

জীবনচৈতন্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিসংখ্যানে সমৃদ্ধ না হলেও এ পর্বে আলাউদ্দিন আল আজাদ বিচিত্র নিরীক্ষায় বাংলাদেশের উপন্যাসকে করে তুলেছেন সমৃদ্ধ। কেবল বিষয়বৈচিত্র্যে নয়, প্রকরণ বিন্যাসেও এ পর্যায়ের উপন্যাস তাৎপর্যপূর্ণ।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রকাশিত আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাসের সংখ্যা বিশটি – *খসড়া কাগজ, স্বাগতম ভালোবাসা, অপর যোদ্ধারা, পুরানা পল্টন, জ্যোৎস্নার অজানা জীবন, যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, অনূদিত অন্ধকার, স্বপ্নশীলা, অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি, শ্যামল ছায়ার সংবাদ, পুরুদ্রুজ, প্রিয় প্রিন্স, কালোজ্যোৎস্নায় চন্দ্রমল্লিকা, বিপরীত নারী, বিশৃঙ্খলা, ঠিকানা ছিল না, তোমাকে যদি না পাই, ক্যাম্পাস, হলুদ পাতার ঘ্রাণ, কায়াহীন ছায়াহীন*প্রভৃতি। এসব উপন্যাসের প্রায় প্রত্যেকটিতে বিষয় হিসেবে এসেছে মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতির চালচিত্র। তদপুরি, সুবিধাবাদী রাজনীতি, তরুণ প্রজন্মের অধোগতি, স্বাধীনতা-বিরোধী চক্রের ষড়যন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধ, লিবিডো-চেতনা, নৈতিক মূল্যবোধ, আধুনিক নর-নারীর প্রেম ও দাম্পত্যজীবনের বিচিত্র জটিলতা, উচ্চবিত্ত শ্রেণির উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, গণমানুষের জাগরণ, নব্বইয়ের ছাত্র আন্দোলন প্রভৃতিও উপস্থাপিত হয়েছে এ-পর্যায়ের উপন্যাসে।

বলা বাহুল্য, বিভাগোত্তর পর্বের উপন্যাসের তুলনায় মুক্তিযুদ্ধোত্তর উপন্যাসসমূহ শিল্পমানে দুর্বল। উপন্যাসের বিষয় নির্বাচনেও তিনি ছিলেন গতানুগতিক ধারার অনুসারী। মুক্তিযুদ্ধের অতিব্যবহারের ফলে এ উপন্যাসসমূহ হয়ে উঠেছে একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর। তদুপরি, আকৃতির দিক থেকে এ পর্যায়ের উপন্যাস স্বাধীনতা-উত্তরকালের উপন্যাসের তুলনায় ছোট।

স্পষ্টত আলাউদ্দিন আল আজাদ বাংলাদেশের সাহিত্যের কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে মৃত্যুর প্রাক-পর্যায় পর্যন্ত তিনি নিরলসভাবে উপন্যাস রচনায় সক্রিয় ছিলেন। চব্বিশটি উপন্যাসের রচয়িতা তিনি। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সচেতনতা তাঁর প্রতিটি উপন্যাসে লক্ষণীয়। প্রগতিশীল জীবনচেতনার প্রতি আমূল বিশ্বস্ত থেকেই তিনি রচনা করেছেন তাঁর উপন্যাস। জীবন ও শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধতাই তাঁর সৃষ্টিশীলতার নিয়ামক উপাদান।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাসসমূহ

(প্রকাশক্রম-অনুসারে)

তেইশ নম্বর তৈলচিত্র : *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০০(প্র. প্র. ১৯৬০)

শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন : *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০০ (প্র. প্র. ১৯৬২)

কর্ণফুলী : *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০০(প্র. প্র. ১৯৬২)

ক্ষুধা ও আশা : *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০০(প্র. প্র. ১৯৬৪)

খসড়া কাগজ : *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০০(প্র. প্র. ১৯৮৩)

শ্যামল ছায়ার সংবাদ : *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০০ (প্র. প্র. ১৯৮৬)

জ্যোৎস্নার অজানা জীবন : *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০০ (প্র. প্র. ১৯৮৬)

যেখানে দাঁড়িয়ে আছি : *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০০ (প্র. প্র. ১৯৮৬)

বিপরীত নারী : *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০০ (প্র. প্র. ১৯৮৬)

কায়াহীন ছায়াহীন : *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০০(প্র. প্র. ১৯৮৬)

স্বাগতম ভালোবাসা : *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০০ (প্র. প্র. ১৯৯১)

অপর যোদ্ধারা : *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০০ (প্র. প্র. ১৯৯১)

পুরানা পল্টন : *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০০ (প্র. প্র. ১৯৯১)

পুরুদ্রুজ : *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০০ (প্র. প্র. ১৯৯১)

ক্যাম্‌পাস : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯৪ (প্র. প্র. ১৯৯১)

অনূদিত অন্ধকার : *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০০ (প্র. প্র. ১৯৯১)

স্বপ্নশিলা : *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০০ (প্র. প্র. ১৯৯২)

অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি : *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০০ (প্র. প্র. ১৯৯৩)

প্রিয় প্রিন্স : *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০০ (প্র. প্র. ১৯৯৫)

কালোজ্যোৎস্নায় চন্দ্রমল্লিকা : *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০০ (প্র. প্র. ১৯৯৬)

বিশৃঙ্খলা : *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০০ (প্র. প্র. ১৯৯৭)

ঠিকানা ছিল না : *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০০ (প্র. প্র. ১৯৯৮)

তোমাকে যদি না পাই : *স্বনির্বাচিত উপন্যাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০০ (প্র. প্র. ১৯৯৮)

হলুদ পাতার ঘ্রাণ : *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০০ (প্র. প্র. ১৯৯৯)

সহায়ক গ্রন্থ (বর্ণক্রম-অনুসারে)

অচ্যুত গোস্বামী : *বাংলা উপন্যাসের ধারা*, কল্লোল বুক সেন্টার, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৪

অনিন্দ্য ভট্টাচার্য : *কথনতত্ত্ব ও বাংলা উপন্যাস*, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১১

অনীক মাহমুদ : *আধুনিক সাহিত্য পরিপ্রেক্ষিত ও প্রতিকৃতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : *কালের প্রতিমা*, ১৯৭৪ দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৯১

অরূপকুমার ভট্টাচার্য : *আঞ্চলিকতা : বাঙলা উপন্যাস*, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৯৮৭

অশ্রুকুমার সিকদার : *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৮

আকিমুন রহমান : *আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩

আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী : সমাজ-রাজনীতি ও সমকাল, ঐতিহ্য, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০০৮

আবু জাফর : *সাহিত্যে সমাজ ভাবনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫

আমিনুর রহমান সুলতান : *বাংলাদেশের উপন্যাস নগরজীবন ও নাগরিক চেতনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০০৩

আহমেদ মাওলা : *বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে প্রবণতাসমূহ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭

কবীর চৌধুরী : *সাহিত্য-কোষ*, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ ২০০৫

কাজী দীন মুহম্মদ : *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৮

কামরুদ্দিন আহমদ : পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি, স্টুডেন্টস পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৩৭৬

খোন্দকার শওকত হোসেন : *বাংলাদেশের উপন্যাস গ্রামীণ সমাজ*, পপুলার পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯২

গিয়াস শামীম (সম্পা.) : *চোখের বালি*, ভাষাপ্রকাশ মুদ্রণ, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫

গিয়াস শামীম (সম্পা.) : *পথের পাঁচালী*, ভাষাপ্রকাশ মুদ্রণ, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫

গিয়াস শামীম : *বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২

গিয়াস শামীম : *বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস*, প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, জুন ২০১৬

গোপিকানাথ রায় চৌধুরী : *রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মান শিল্প*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ২০১০

তানিম জসিম (সম্পা.) : *শ্রেষ্ঠ গল্প : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, প্রথম প্রকাশ, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬

নাজমা জেসমিন চৌধুরী : *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, মুক্তধারা, ঢাকা

প্রসেনজিৎ মৃধা : *উপন্যাসের আঙ্গিক ও তারাশঙ্কর*, একুশ শতক, কলকাতা, ২০১২

ফরিদা সুলতানা : *বাংলাদেশের উপন্যাসে জীবন চেতনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯

বিশ্বজিৎ ঘোষ : *বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ*, *বাংলা একাডেমি*, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০০২

বিশ্বজিৎ ঘোষ : *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭

মনসুর মুসা : *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*, অ্যাডর্ণ পাবলিকেশন, ঢাকা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ২০০৮

মীর হুমায়ূন কবীর(সম্পা.) : *শ্রেষ্ঠ গল্প : বনফুল*, প্রথম প্রকাশ, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬

মুস্তফা নূরউল ইসলাম : *বাংলাদেশের উপন্যাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান : *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, দশম মুদ্রণ ২০০৮

মুহম্মদ ইদরিস আলী : *আমাদের উপন্যাসে বিষয়-চেতনা : বিভাগোত্তর কাল*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮

মুহম্মদ ইদরিস আলী : *বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫

রণেশ দাশগুপ্ত : *উপন্যাসের শিল্পরূপ*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১০

রফিকউল্লাহ খান : *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ২০০৯

রশীদ আল ফারুকী : *বাংলার জাগরণ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫

রিষিণ পরিমল : *প্রসঙ্গ মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস ও অন্যান্য*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯

শহীদ ইকবাল : *রাজনৈতিক চেতনা : বাংলাদেশের উপন্যাস*, সাহিত্যিকা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০০৩

শাহীদা আখতার : *পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯২

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ ১৩৮০

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, সাতিত্যশ্রী, কলকাতা, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৭১

সারোয়ার জাহান : *বাংলা উপন্যাস : সেকাল একাল*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১

সুধাময় দাস : *বাংলা উপন্যাসে চিত্রিত জীবন ও সমাজ*, কালিকলম প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫

সিকদার আবুল বাশার (সম্পা.) : *আলাউদ্দিন আল আজাদ : জীবন ও সাহিত্য*, বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০০৩

সৈয়দ আকরম হোসেন : *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫

সৈয়দ আকরম হোসেন : *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৩৮৮

স্বপ্না রায় : *বাংলাদেশের উপন্যাসে সমাজচেতনা*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬

হাসান আজিজুল হক : *কথাসাহিত্যের কথকতা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪

সহায়ক পত্র-পত্রিকা

কালি ও কলম : আবুল হাসনাত (সম্পাদক), অষ্টম বর্ষ : একাদশ সংখ্যা, পৌষ ১৪১৮, ডিসেম্বর ২০১১

বাংলা একাডেমি পত্রিকা : শামসুজ্জামান খান (সম্পাদক), ৫৫ বর্ষ : ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১১

মাসিক উত্তরাধিকার : শামসুজ্জামান খান (সম্পাদক), মাঘ ১৪১৭

সাহিত্য পত্রিকা : মোহাম্মদ আবু জাফর (সম্পাদক), বর্ষ-৪৭, সংখ্যা-৩, চৈত্র ১৪১২-আষাঢ় ১৪১৩ : মার্চ-জুন ২০০৬

দৈনিক জনকণ্ঠ : ৬ই মে, ১৯৯৮; ৬ই মে, ২০০২; ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯; ৫ই মে, ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

Terry Eagleton : *The English Novel : An Introduction*, Blackwell Publishing, 2005

Ralph Fox : *The Novel and the people*, Progress publishers, Moscow, 1937

সহায়ক প্রবন্ধ

মাসুদুজ্জামান : বাংলাদেশের উপন্যাস : গ্রাম-বাংলার কথকতা, *একুশের প্রবন্ধ*, ১৯৯৮, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

রফিকউল্লাহ খান : বাংলাদেশের উপন্যাস : শিল্পরীতির বিবর্তন, *একুশের প্রবন্ধ*, ২০০২, বাংলা একাডেমি, ঢাকা